বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

B-CORE-310

বাংলা ছোটগল্প

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক কেকা ঘটক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শান্তনু মণ্ডল — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. পীযূষ পোদ্দার — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সীমা সরকার — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সারদা মাহাতো — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. রাজশেখর নন্দী — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. শ্রাবন্তী পান — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডিওডিএল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

B-CORE-310

বাংলা ছোটগল্প

পর্যায় গ্রন্থ : ১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, রাজশেখর বসু (প্রতি লেখকের ১টি করে নির্বাচিত গল্প)

একক–১ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রসময়ীর রসিকতা

একক–২ : বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় — নিমগাছ

একক–৩ : প্রেমেন্দ্র মিত্র — মহানগর

একক–৪ : রাজশেখর বসু — গা মানুষ জাতির কথা

পর্যায় গ্রন্থ : ২ নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (প্রতি লেখকের ১টি করে নির্বাচিত গল্প)

একক–৫ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র — রস

একক–৬ : সুবোধ ঘোষ — সুন্দরম

একক–৭ : কমলকুমার মজুমদার — নিম অন্নপূর্ণা

একক–৮ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী — গিরগিটি

পর্যায় গ্রন্থ : ৩ সমরেশ বসু, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, মতি নন্দী (প্রতি লেখকের ১টি করে নির্বাচিত গল্প)

একক–৯ : সমরেশ বসু — শহীদের মা

একক–১০ : বিমল কর — জননী

একক–১১ : মতি নন্দী — শবাগার

একক–১২ : সন্তোষকুমার ঘোষ — ভেবেছিলাম

পর্যায় গ্রন্থ : ৪ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সত্যজিৎ রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (প্রতি লেখকের ১টি করে নির্বাচিত গল্প)

একক–১৩ : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — গাছটা বলেছিল

একক–১৪ : সত্যজিৎ রায় — পিকুর ডায়রি

একক–১৫ : মহাশ্বেতা দেবী — দ্রৌপদী

একক–১৬ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ওরা এই পৃথিবীর কেউ না

সূচিপত্র

B-CORE-310

বাংলা ছোটগল্প

B-CORE 310	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ : ১	১.	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — রসময়ীর রসিকতা	ড. রাজশেখর নন্দী	১-১০
	২.	বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় — নিমগাছ	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	১১-১২
	৩.	প্রেমেন্দ্র মিত্র — মহানগর	ড. রাজশেখর নন্দী	১৩-২৪
	৪.	রাজশেখর বসু — গা মানুষ জাতির কথা	অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী	২৫-২৬
পর্যায় গ্রন্থ : ২	৫.	নরেন্দ্রনাথ মিত্র — রস	ড. রাজশেখর নন্দী	২৭-৩৭
	৬.	সুবোধ ঘোষ — সুন্দরম	অধ্যাপক কেকা ঘটক	৩৮-৪৩
	৭.	কমলকুমার মজুমদার — নিম অন্নপূর্ণা	ড. রাজশেখর নন্দী	৪৪-৫০
	৮.	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী — গিরগিটি	ড. রাজশেখর নন্দী	৫১-৬০
পর্যায় গ্রন্থ : ৩	৯.	সমরেশ বসু — শহীদের মা	ড. সারদা মাহাতো	৬১-৬৮
	১০.	বিমল কর — জননী	অধ্যাপক কেকা ঘটক	৬৯-৭৩
	১১.	মতি নন্দী — শবাগার	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	৭৪-৭৯
	১২.	সন্তোষকুমার ঘোষ — ভেবেছিলাম	ড. পীযূষ পোদ্দার	৮০-৮২
পর্যায় গ্রন্থ : ৪	১৩.	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — গাছটা বলেছিল	ড. সীমা সরকার	৮৩-৮৮
	১৪.	সত্যজিৎ রায় — পিকুর ডায়রি	ড. শ্রাবন্তী পান	৮৯-৯৬
	১৫.	মহাশ্বেতা দেবী — দ্রৌপদী	ড. শ্রাবন্তী পান	৯৭-১০৫
	১৬.	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ওরা এই পৃথিবীর কেউ না	ড. শান্তনু মণ্ডল	১০৬-১০৮

পত্র : বি-কোর - ৩১০

বাংলা ছোটগল্প

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক - ১

রসময়ীর রসিকতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বিন্যাসক্রম

৩১০.১.১.১ : গল্পকার পরিচয়

৩১০.১.১.২ : গল্প পরিচিতি

৩১০.১.১.৩ : নামকরণ

৩১০.১.১.৪ : কৌতুক রসের গল্প

৩১০.১.১.৫ : চরিত্র পরিচয়

৩১০.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.১.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.১.১.১ : গল্পকার পরিচয়

ছোটগল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম তারিখ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি। লেখকের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামের মামারবাড়িতে। লেখকের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তখন বসবাস করতেন হুগলী জেলার গুড়াপ গ্রামে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিহারের জামালপুরের স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি পাটনা কলেজ থেকে এফ এ, বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়ার জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিদেশে গিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জামালপুর

উচ্চবিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সিমলাতে ভারত সরকারের সমর দপ্তরে কিছুদিন দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তারপরে কলকাতা শহরে টেলিগ্রাফ দপ্তরে কিছুদিন করণিকের কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকার হাত ধরে। তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত গল্প "একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত" (১৮৯৬)। "শ্রী বিলাসের দুর্বুদ্ধি" নামক ছোটগল্পটিই তাঁর প্রথম রচনা। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর লেখা ১০৮ টি গল্পকে কেন্দ্র করে ১২টি গল্প— সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি হলো— 'নবকথা' (১৮৯৯), 'ষোড়শী' (১৯০৬), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পাঞ্জলি' (১৯১৩), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৪), 'বিলাসিনী ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প'(১৯২৮), 'নতুন বউ ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯) এবং 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১)।

আমরা সকলেই জানি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অগ্রজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পরবর্তীকালের ছোটগল্পকার হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রাধামণি দেবী ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেছিলেন। আমাদের পাঠ্য 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি 'গল্পাঞ্জলি'(১৯১৩) গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছিলেন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ এপ্রিল।

৩১০.১.১.২ : গল্প পরিচিতি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যখন গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন তখন ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। সমাজে বহুবিধ সমস্যা ও নানারকম কুসংস্কার ছিল। ধর্মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যেত। সেইসময় কৌলিন্যপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ঠগীদমন সাধারণ মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। সমাজে নারীদের অবস্থাও ছিল খুবই সংকটজনক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— রসময়ী, বিনোদিনী ও ক্ষেত্রমোহনবাবু। তাছাড়াও রসময়ীর দুই ভাই নবীন ও সুবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটিতে আটটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে— "ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিনী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।"

ক্ষেত্রমোহনের বয়স চল্লিশ বছর। সে একজন আইনজীবী। ক্ষেত্রমোহন হুগলী জেলায় বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেছেন। অপরদিকে ক্ষেত্রমোহনের স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ বছর। তার বাপের বাড়ি উত্তরচব্বিশ পরগণার হালিশহরে। আঠের বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। ক্ষেত্রমোহনের বাড়ির লোকজন ভালো ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার কথাও বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই কোনো

কাজ হয়নি। বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিবারের লোকজন তখন ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয়বার বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন। রসময়ীর সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনের এই নিয়ে অনেকবার তর্ক-বির্তকও হয়েছে। কখনো রসময়ী রাগ করে হালিশহরে বাপের বাড়ি চলে এসেছে, তখন ক্ষেত্রমোহন অনেক বুঝিয়ে রসময়ীকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

গল্পপাঠে আমরা জানতে পেরেছি, ক্ষেত্রমোহন মোক্তারের কাজ করেন, সেইসূত্রেই অনেক লোকের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। নিজের কর্ম মনোযোগ দিয়ে করার ফলে সে ভালো অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু নিজের সন্তান নেই বলে প্রায়ই মনমরা হয়ে থাকে। অভিমানবশত ক্ষেত্রমোহনের মাঝে-মাঝে রসময়ীর সঙ্গে ঝগড়া, বাক্- বিতণ্ডা, মন কষা-কষি লেগেই থাকতো। পারিবারিক ঝগড়া, তর্ক-বির্তক একদিন চরমসীমা অতিক্রম করলে রসময়ী,ক্ষেত্রমোহনের বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপর থেকে প্রায় এক মাস হলো হালিশহরে বাবার বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেছে। ক্ষেত্রমোহন আগে অনেক অনুনয়-বিনুনয় করে রসময়ীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এবারে রাগের বশত আর রসময়ীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি। ক্ষেত্রমোহনও জেদের বশে অন্য জায়গায় বিয়ে করবে, তবুও এ বাড়িতে রসময়ীকে আর ঢুকতে দেবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে।

পরবর্তীকালে 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে দেখা যায়, একজন বালক প্রায়ই নৌকাযোগে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে যেত পড়াশোনা করতে। সেই বালকটি গ্রামে এসে প্রচার করে দিয়েছে, ক্ষেত্রমোহনবাবুর চুঁচুড়োয় দ্বিতীয়বার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সে বিয়ের কথা শুনেছে সুরেশের কাছ থেকে। সুরেশ তাদের ক্লাসেই পড়াশোনা করে। সুরেশের মামাবাড়ি চুঁচুড়োয়। তার মামার নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুজ্জ্যে। সুরেশের মামা চুঁচুড়োয় জজ আদালতে কাজ করেন। তার মামার মেয়ের বয়স সম্ভবত তেরো বছর। মেয়েটি দেখতে শুনতে বেশ ভালো। রসময়ী ও বিনোদিনী বালকটিকে ঘুড়ি-নাটাই কিনে দেবে বলে প্রলোভন দেখিয়েছে। সে যেন তাদেরকে চুঁচুড়োয় সুরেশের মামার বাড়িতে নিয়ে যায়। গল্পে দেখা যায় — "তাদের একবার মিনতি করে বলে কয়ে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না। তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।" রসময়ী ও বিনোদিনী বালকটিকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশের মামারবাড়িতে গেছে। বাড়ির গিন্নীমাকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পেরেছে— 'বিশে মাঘ' বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। বিনোদিনী, গিন্নীমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?" তার উত্তরে গিন্নীমা বলেছেন—"হ্যাঁ — সতীন আছে বটে— কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।" এতক্ষণ ধরে রসময়ী চুপচাপ সব কথা শুনে যাচ্ছিল, কোনো উত্তর দেয়নি। গিন্নীমার কাছ থেকে সত্য কথা শোনার পর ক্ষেত্রমোহনের উপর প্রচণ্ড রাগ হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে রসময়ী বাড়ির অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর ক্রোধের বশে আক্রমণ শুরু করেছে। রসময়ীকে বলতে শোনা গেছে, আমার স্বামী ছাড়া কি তোমাদের মেয়ের অন্য পাত্র জুটলো না। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই তাড়া করে গেছে। পাত্রীকে উদ্দেশ্য করে রসময়ী বলেছে— "কনেটি গেলো কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই।" বাড়ির লোকজন কোনো উপায় না দেখে পুলিশের কথা বলতে শুরু করলে, চুঁচুড়োর

বাড়ি থেকে রসময়ী ও বিনোদিনী পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় হরিশ্চন্দ্রবাবু ও তার গৃহিনী ঠাণ্ডা মাথায় বিচার-বিবেচনা করে ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে কন্যাদান করতে রাজী হলেন না।

গল্পপাঠ করে আমরা জানতে পেরেছি, হরিশ্চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে ক্ষেত্রমোহন রসময়ীর কাণ্ডকারখানা শুনে হতবাক হয়ে গেছেন। কাছারি থেকে বাড়ি ফিরে এসে ক্ষেত্রমোহন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মতো রসময়ী, ক্ষেত্রমোহনের সামনে হাজির হয়েছে। রসময়ী কয়েক মুহূর্ত কথা না বলে, ক্ষেত্রমোহনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তখন রসময়ীকে উদ্দেশ্য করে ক্ষেত্রমোহনকে বলতে শোনা গেছে, কী মনে করে এখানে আগমন? তার উত্তরে রসময়ী জানিয়েছে— "একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে। হরিশ্চন্দ্রবাবুর তের বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের পিড়িতে বসতে তোমার লজ্জা করল না। কি করুণ পরিণতি। এখনো আমি বেঁচে আছি। আমি বেঁচে থাকতে এ বিয়ে কিছুতেই হতে দেব না। মা ও মেয়ের সর্বনাশ হবে তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। সেই পরিস্থিতিতে ক্ষেত্রমোহন রেগে গিয়ে রসময়ীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?" ক্ষেত্রমোহন না থেমে রসময়ীকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেছে, তুমি না মরলে আর বিয়ে করছি নে। আর মরবে কবে? এই কথা শুনে রসময়ী বিদ্রুপের স্বরে হা-হা করে হেসে উঠেছে। রসময়ী, ক্ষেত্রমোহনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী— বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে— বুড়ো থুড়থুড়ো হবে— ভুয়ে — মুয়ে হয়ে যাবে — তখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না— তখন আমি মরব।"

তারপর প্রায় ছয় মাস কেটে গেছে। রসময়ীর প্রচণ্ড শরীর খারাপ। হালিশহরে বাপের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী। ক্ষেত্রমোহন চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করেনি। যথাসাধ্য সে চেষ্টা করেছে, রসময়ীকে সারিয়ে তোলার। কিন্তু কিছুতেই কিছু কাজ হয়নি। শেষ পর্যন্ত রসময়ীকে বাঁচানো যায়নি। "গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য সংসারের মায়া— যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর ঝর করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।"

রসময়ী মারা যাবার পর, আরও ছয় মাস কেটে গেছে। অবশেষে ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর শোক ভুলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার জন্য মনস্থির করে ফেলেছে। রজনীকান্তবাবু ইংরেজী লেখাপড়া জানা ব্যক্তি। বড় জমিদারের নায়েব। রজনীকান্তবাবুর মেয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়ার কথাবার্তা শুরু হয়েছে। এমন সময় পোস্ট অফিসের পিয়ন ক্ষেত্রমোহনবাবুর হাতে একটি চিঠি দিয়ে গেলেন। চিঠিটির খামের উপরের অংশ বেগুনি রঙের ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা। চিঠিটি পড়ে ক্ষেত্রমোহনবাবু জানতে পেরেছেন— চিঠিটি মৃত রসময়ীরই হাতের লেখা। রসময়ী লিখেছে— "বাড়ির সামনের যে বটগাছ আছে, তাতে আমি আজ কাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোথায় যাও সবই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। ক্ষেত্রমোহন যদি বিয়ে করে তবে তার দুর্গতির শেষ নেই। বিবাহ করিও না। করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে।"

রজনীকান্তবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে যাওয়ার পর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে ফাল্গুন মাসের ৮ তারিখ। গল্পটি পাঠ করে আমরা জানতে পেরেছি ক্ষেত্রমোহনবাবুর মনে ভূতের ভয়ও যথেষ্ট রয়েছে। আবার বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার আগ্রহ দেখা গেছে। সেইজন্য দুইবাড়ির মতামত নিয়ে রজনীকান্তবাবুর মেয়ের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনের বিয়ের আশীর্বাদ পাকাপাকিভাবে শেষ হয়েছে। পরক্ষণেই ক্ষেত্রমোহনের কাছে রসময়ীর হাতের লেখা দ্বিতীয় চিঠিটি এসেছে। সেই চিঠিতে রসময়ী উল্লেখ করেছে —"রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্যেও বিবাহ করিবে। এখনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভীর রাত্তিরে তুমি যখন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঙ্গিবে না।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে খুড়ো মহাশয় ক্ষেত্রমোহনকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্ষেত্রমোহন খুড়ো মহাশয়ের কথায় গুরুত্ব দেননি। খুড়ো মহাশয়, ক্ষেত্রমোহনকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছিলেন— রসময়ীর মৃত্যুর এক বছর অতিক্রম করার পর গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে আসলে ভূত—প্রেত উদ্ধার হয়ে যাবে। তখন নির্বিঘ্নে শুভকর্ম সম্পন্ন করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমোহন কন্যার পিতার সঙ্গে কথা বলে পারিবারিক সমস্যার কথা জানালেন। কন্যার পিতা তাতে সম্মত হলে বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় কর্ম আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সেইসঙ্গেই ক্ষেত্রমোহনের উপর জালিয়াতি মোকর্দমার তদ্বিরের দায়িত্ব এসে পড়ায় তিনিও মোকর্দমার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মোকর্দমার আগের দিন সন্ধেবেলা কাছারি থেকে ফেরার সময় ক্ষেত্রমোহন রসময়ীর হাতের লেখা তৃতীয় চিঠিটি পেয়েছেন। সেই চিঠিতে ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা রয়েছে— "শুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিয়াছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়িতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"সেইপরিস্থিতিতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রমোহনকে বলেছেন— বিয়ে করবার পরিকল্পনা মাথা থেকে না সরিয়ে ফেললে, আপনার মহাবিপদ নেমে আসবে। ক্ষেত্রমোহন ভয়ে চিন্তা করতে করতে ভাবছিলেন— "তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই।" এমন সময় একজন লোক এসে খবর দিলেন হালিশহরে রসময়ীর বাপের বাড়িতে বাজি পোড়াতে গিয়ে বোমার আঘাতে ক্ষেত্রমোহনের ছোট সম্বন্ধী সুবোধ আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। সব কাজ ফেলে তখন সুবোধকে দেখতে ক্ষেত্রমোহন গাড়ি ভাড়া করে হাঁসপাতালে ছুটেছেন। সেখানে গিয়ে দেখেছেন রসময়ীর দিদি বিনোদিনীও উপস্থিত হয়েছে। রসময়ীর বাবার বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষেত্রমোহন জানতে পেরেছে,সুবোধের অবস্থা খুবই সংকটজনক। চিকিৎসকেরা সেবা-শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে সুবোধকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। চিকিৎসকেরা বলেছেন, এখানে রাত্রিবেলা বাড়ির লোকজনদের থাকতে দেওয়া হয় না। অসুস্থ মানুষকে দেখার জন্য পরের দিন সকালবেলায় এসে দেখা করতে পারে। তখন কোনো উপায় না দেখতে পেয়ে ক্ষেত্রমোহন বিনোদিনীর কথামতো রাত্রে শ্বশুরবাড়িতে রাত কাটিয়েছেন। হালিশহরে থাকার সময় ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে ক্ষেত্রমোহন দেখলেন, লাল পাগড়ি মাথায় দিয়ে পুলিশের দল তার শ্বশুরবাড়ি ঘিরে ফেলেছে। পুলিশের কাছে নাকি খবর ছিল, এই বাড়িতে বোমা তৈরি করা হয়। সেইজন্য পুলিশ তদন্ত করে দেখার জন্য ক্ষেত্রমোহনের শ্বশুরবাড়িতে হাজির হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে

ঐ বাড়ি থেকে বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা কিছুই পায়নি। তবে বাড়ি থেকে যা পাওয়া গেছে,তা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। "হিন্দু সৎকর্মমালা, গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস।" সেইসঙ্গে পাওয়া গেছে—"বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।" পুলিশের দল বাড়ির সমস্ত জিনিস উদ্ধার করে উঠোনে জমা করে রেখেছেন। একজন পুলিশকর্মী সেইসমস্ত জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত রয়েছেন। তখন ক্ষেত্রমোহন দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করে দেখলেন, সাদা খামগুলির প্রত্যেকটিতেই ক্ষেত্রমোহনের নাম লেখা এবং রসময়ীর হাতের লেখার দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা চিঠিগুলি রসময়ীরই হাতের লেখা, তা এখন ক্ষেত্রমোহনের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। রসময়ীর মনের ভাব চিঠিগুলি পাঠ করলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। "একখানাতে আছে— গয়ার পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।" ক্ষেত্রমোহন উঠোন থেকে আর একটি চিঠি হাতে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করলেন,সেই চিঠিতে রসময়ী, ক্ষেত্রমোহনকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে— "কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" রসময়ী, ক্ষেত্রমোহনের দ্বিতীয় বিয়েতে কোনভাবেই রাজী ছিলেন না, তা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার বোঝা যায়। রসময়ীর জীবনের করুণ পরিণতি আর কোনো মেয়ের যাতে না হয়, তারজন্য সে সর্বদাই সংগ্রাম করে চলেছে। ক্ষেত্রমোহনের মতো মানুষদের বিরুদ্ধে রসময়ীর প্রতিবাদ ধরা পড়েছে চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে।

এভাবে আলোচ্য গল্পের পটভূমিতে ধরা পড়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদ। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রসময়ীর সংশয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। পারিবারিক সংকটে আবদ্ধ রসময়ী ও বিনোদিনীর মতো মানুষদের জীবনের ক্ষতস্থানকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। রসময়ীর দিদি বিনোদিনীর জীবনযন্ত্রণা ও পাঠকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। রসময়ীর পারিবারিক জীবনের হাহাকারকে সমাধান করার সাধ্য তার বিধবা দিদি বিনোদিনীর নেই। সুস্থ-স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিবর্তে জটিল মানসিকতার বাস্তব ও নির্মম প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটিতে। বিনোদিনীর ক্ষমতা নেই এককভাবে প্রতিবাদ করার। তাই নীরবে অভিশপ্ত জীবনকে মেনে নিয়ে তৃপ্তি পায়নি। বিনোদিনীর করুণ অভিজ্ঞতার জীবন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের শেষে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের শেষে বলেছেন— "বিনোদিনী তুলসী তলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন— ঠাকুরঝি,এসব কী? ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।"

৩১০.১.১.৩ : নামকরণ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটির নামকরণ প্রধান চরিত্র রসময়ীকে উদ্দেশ্য করেই প্রাধান্য পেয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছেলের বাড়ির লোকজন সবসময় ভাবে, মেয়ের বাড়ির লোকজন তাদের কথামতো চলবে। তারা যখন যা বলবে তাই মেয়ের বাড়ির লোকজন মেনে চলবে। সে দিন আর

নেই। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আমরা সকলেই জানি, রসিকতা অর্থে 'রসের কথা' বা 'রঙ্গ কৌতুক'। আমাদের পাঠ্য গল্পটিতে বেগুনী রঙের ম্যাজেন্টা কালিতে লেখা রসময়ীর চিঠিগুলি রসময়ীর জীবনের নানা অবস্থা কল্পনা করে লেখা হয়েছে। 'বাংলা ছোটগল্প' গ্রন্থে শিশিরকুমার দাশ বলেছেন— "রসময়ীর লেখা চিঠি সব, তিনি জীবদ্দশায় স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা অনুমান করেই ঐসব 'ভৌতিক' চিঠিগুলি লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারী এক রমণীই বিবাহের মুহূর্ত এগিয়ে আসার প্রতি পর্বেই সেই চিঠিগুলি পাঠাচ্ছেন। হাসির হিল্লোলে ভৌতিক আবহাওয়া ভেসে যায়, সব কুয়াশা কেটে যায় এক নির্মল কৌতুকের আলোয়।" (পৃষ্ঠা-১৫৩) রসময়ীর লেখা চিঠিগুলির প্রসঙ্গে গল্পপাঠক না হেসে থাকতে পারে না। আবার ঐ চিঠির জন্যেই ক্ষেত্রমোহনের মতো মানুষ ভয় পেয়ে বুড়ো বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থেকেছে।

৩১০.১.১.৪ : কৌতুক রসের গল্প

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পটি কৌতুক রসে মিশ্রিত হয়ে শিল্পসার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। দাম্পত্য প্রেমের মধ্যেও যে পরিহাস বা ঠাট্টা রয়েছে তা আলোচ্য গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন— "তোমার গল্পগুলি ভারি ভালো। হাসির হাওয়ায় ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথায় যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোটগল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্যের রশ্মির মত।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন মুখ্যত তাঁর হাস্যরসাত্মক গল্পের জন্য। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "গল্প সূচনায় পরিচ্ছেদগুলি পড়েই পাঠকমন এক ঘটনা —প্রত্যাশায় কৌতূহলী হয়ে ওঠে। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গিটি আপাত-নিরীহ, আপাত- নিরাসক্ত, ভিতরে ভিতরে কৌতুকের ফল্গু প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহমান। পড়তে না পড়তেই পাঠকের মনে হয়, এবার বোধ হয় মজা শুরু হবে।" (পৃষ্ঠা-১৪২) 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে রসময়ীর আচরণে পাঠকদের মনে হাস্যরসের সঞ্চার করেছে। রসময়ী বলেছে— "রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্যেও বিবাহ করিবে। এখনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভীর রাত্তিরে তুমি যখন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাঙ্গিবে না।" কৌতুক রসে পূর্ণ লাইনগুলি পাঠ করে গল্পে পাঠক না হেসে থাকতে পারেনি। রসময়ীর কর্মকাণ্ডের জন্যেই সমস্ত পাঠক কৌতুক রস উপভোগ করেছে। 'বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয়' গ্রন্থে— অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"গল্পের মধ্যে ও শেষে চমক সৃষ্টিতে কিংবা অপ্রত্যাশিত পরিণাম রচনাতে প্রভাতকুমার তুলনাহীন। এই ধরণের গল্প বাছাই করা মুশকিল। তবু তাঁর 'মাস্টার মহাশয়', 'বাজীকর', 'রসময়ীর রসিকতা' ইত্যাদি গল্প পাঠকের সহজেই মনে পড়ে।" (পৃষ্ঠা- ২৫) ক্ষেত্রমোহনবাবু তাঁর স্ত্রী রসময়ীকে নিয়ে কলহে ও সন্ধিতে জীবন কাটিয়ে যখন বিপর্যস্ত, তখন, রসময়ীর লেখা চিঠি ক্রমাগত আসে এবং ক্ষেত্রমোহনবাবুকে অস্থির করে তোলে। ক্ষেত্রমোহনবাবু ভাবেন গয়ায় পিণ্ড দিলে শান্তি পাবেন ও পুনর্বার বিবাহ করতে পারবেন।

তখনই মৃতা স্ত্রীর চিঠি পান— "গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেশ ধরিয়া রেল গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।" ঘটনা প্রবাহ যখন অলৌকিক রসে সিক্ত, তখনই সমাপ্তিতে চমক লক্ষ্য করা যায়। হালিশহরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ক্ষেত্রমোহন খুঁজে পান রসময়ীর হাতে লেখা নানা চিঠি ও তার নামে লেখা খাম। নানা অবস্থা কল্পনা করে রসময়ী সতর্কবাণীতে যা লিখেছে, তা পড়েই তিনি মূল ব্যাপার বা রহস্য বুঝতে পারেন। গল্পটি ভৌতিক নয়, কিন্তু পরিবেশ, আবহ রচনার প্রেতলোক যেন জীবন্ত হয়েছে। গল্পের উপসংহার এতই চমকপ্রদ ও আকস্মিক যে, এ কাজের জন্যে লেখককে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

৩১০.১.১.৫ : চরিত্র পরিচয়

আমরা সকলেই জানি গল্পের প্লট বা কাহিনি তৈরি হয় চরিত্রকে আশ্রয় করে। শুধুমাত্র চরিত্রের বাহ্যিক জীবনধারণ পদ্ধতিই নয়, তার মনস্তাত্ত্বিক জীবনদর্শনকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। চরিত্রের প্রকৃতি সাধারণত দুই ধরণের হয়ে থাকে— ক) টাইপ চরিত্র খ) ব্যক্তি কেন্দ্রিক চরিত্র।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে প্রধান চরিত্র হলো তিনজন। তারা হলেন— রসময়ী, বিনোদিনী ও ক্ষেত্রমোহন। রসময়ীর সম্পর্কে দুইভাই নবীন ও সুবোধের পরিচয়ও আলোচ্য গল্পে পাওয়া যায়।

রসময়ী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের প্রধান চরিত্র হল— রসময়ী। রসময়ী স্বভাবে হিংসুটে প্রকৃতির। তার স্বামী ক্ষেত্রমোহন। আঠেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে তাদের কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি। পরিবারে সন্তান না হওয়ার জন্য মানসিকভাবে তারা নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছে। রসময়ীর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। সে মাঝে-মধ্যে ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে ঝগড়া করে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। "হালিশহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে— মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। তখন সে বাড়িতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোটভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে।" ক্ষেত্রমোহন বেশি বয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার কথা বললে,রসময়ী তার উপরে রাগ করেছে। রসময়ীর ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় চুঁচুড়োয় হরিশ্চন্দ্র চাটুজ্যের বাড়িতে। রসময়ী গিন্নীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিনীর উপর শপাশপ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল, কেন? —কেন? আর কি মরবার জায়গা পেলে না? আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না।" সর্বোপরি রসময়ী জীবন সংগ্রামী ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ক্ষেত্রমোহন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে ক্ষেত্রমোহন হলেন অন্যতম বিখ্যাত চরিত্র। ক্ষেত্রমোহনের বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি মোক্তার মানুষ। সারাদিন প্রচুর মানুষের সঙ্গে কোর্ট চত্বরে তাকে কাজ করতে হয়। হুগলী জেলায় নিজের পিতৃগৃহ রয়েছে। গল্প পাঠ করে আমরা জানতে

পারি তার স্ত্রী রসময়ীর আচরণ খুব ভয়ংকর প্রকৃতির। "ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিনী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।" পাঠ্য গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে পারিবারিক সংকটের কথা তুলে ধরা হয়েছে। স্ত্রী রসময়ীর প্রতি স্বামী ক্ষেত্রমোহনের উদাসীনতা গল্পটিতে লক্ষ্য করা গেছে। ক্ষেত্রমোহন সংসারী লোক হয়েও তার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব তুলে ধরা হয়েছে। আঠের বছরের দাম্পত্য জীবনে সন্তান-সন্ততি না হওয়ার জন্য ক্ষেত্রমোহন দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ক্ষেত্রমোহনের মতো মানুষ সংসার জীবন অতিবাহিত করার জন্য শুধুমাত্র মোক্তারের চর্চা করে গেছে। কিন্তু জীবনের খাতা অনেক বড়ো। সেখানে অন্য ভাষায়, অন্য বিদ্যায়, অন্য কালিতে লিখতে হয়। সে ভাষা বা বিদ্যা কোনটাই ক্ষেত্রমোহনের জানা ছিল না বলে পারিবারিক সংকট নেমে এসেছিল। রসময়ীর মৃত্যুর পর, রসময়ীর হাতের লেখা চিঠিগুলি পেয়ে ক্ষেত্রমোহন চরিত্রের আতঙ্ক ধরা পড়েছে। "ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কোনো সন্দেহ নাই। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানান ভুল চিরকাল হত, এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রী শ্রী এক জায়গায়,দুর্গা একটু তফাতে লিখত— এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তাছাড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্বদা ব্যবহার করত।"

বিনোদিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে বিনোদিনী হলেন অন্যতম নারী চরিত্র। গল্পটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বিনোদিনীর ছোটবেলায় বিবাহ হয়েছিল। স্বামী মারা যাওয়ার কারণে বিনোদিনী বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেছে। তারপর থেকে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে হালিশহরে বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সামাজিক শোষণের মাত্রা বিনোদিনীর উপর অসম্মান করেছে। তবুও বিনোদিনী স্থির ও অবিচল ভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে। পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করেনি। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে সামাজিক শোষণ ও নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধরা পড়েছে রসময়ীর হাতের লেখা তিনটি চিঠির প্রসঙ্গে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, রসময়ী মারা যাবার পর ক্ষেত্রমোহনের উদ্দেশ্যে চিঠিগুলি প্রেরণ করেছে বিনোদিনী নিজে। বিনোদিনী চরিত্রের জন্যেই রসময়ী মারা যাবার পরেও তাকে নিয়ে চর্চা হয়েছে। পরিবারে ভৌতিক চিঠিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য রসময়ী যে ভাবে প্রতিবাদের পথ বেছে নিয়েছে তা সমাজের কাছে দৃষ্টান্তমূলক হয়ে আছে। সমাজে নারী কেবল পুরুষের অধিকারের সামগ্রী নয়,তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য রসময়ীর চিঠিগুলির গুরুত্ব আছে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে নারীদের নিগ্রহ, অবমাননা অনেক দিন ধরেই চলে আসছে। সামাজিক শোষণ নারীজাতিকে বারে বারেই অসম্মান করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিনোদিনীর নীরব প্রতিবাদ ধরা পড়েছে 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের শেষে—"বিনোদিনী তুলসী তলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন— ঠাকুরঝি, এসব কী? ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।" জীবনরসরসিক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিপুণ তুলিতে বিনোদিনী চরিত্রটিকে গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিধবা নারীদের হৃদয় যন্ত্রণা বিনোদিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

৩১০.১.১.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে প্রতিবাদী নারী চরিত্রের যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পের নামকরণ সর্ম্পকে আলোচনা করো।

৩। 'রসময়ীর রসিকতা' গল্পে বিনোদিনীর চরিত্র চিত্রণে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব আলোচনা করো।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রসময়ীর রসিকতা গল্পে কৌতুক রস সর্ম্পকে আলোচনা করো।

৩১০.১.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নির্বাচিত সরস গল্প— সম্পাদনা বিমল কর।

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (প্রথম খণ্ড)— বীরেন্দ্র দত্ত।

৩। কালের পুত্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয়— তরুণ মুখোপাধ্যায়।

৫। বাংলা ছোটগল্প—শিশিরকুমার দাশ।

একক - ২

নিমগাছ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বিন্যাসক্রম :

৩১০.১.২.১ : লেখক পরিচিতি—বনফুল

৩১০.১.২.২ : গল্প পরিচয়—নিমগাছ

৩১০.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.১.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.১.২.১ : লেখক পরিচিতি—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) ছোটোগল্পের জগতে এক অসামান্য শিল্পী। তাঁর অধিকাংশ ছোটোগল্পের পরিণতিতে একটা চমক থাকে। বনফুলের জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল এই যে অতি সাধারণ উপকরণ, অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি মুহূর্ত নির্বাচন করে বিচিত্র অনুভবের পরিস্ফুটনে এবং স্বীয় পরিবেশন নৈপুণ্যে তা প্রাণময় করে তোলেন।

ছোটোগল্পের শিল্পরূপগত বিচারে তার প্রতিবেশী হল একাঙ্ক নাটক এবং লিরিক কবিতা। বনফুল তাঁর ছোটোগল্পে এই শিল্পরূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছোটোগল্পকে একাঙ্ক নাটক এবং লিরিক কবিতা গুণাবলীকে একত্রে সমন্বিত করে ছোটোগল্পের গঠনশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলেছেন।

৩১০.১.২.২ : গল্প পরিচয়—নিমগাছ

কাহিনী সংক্ষেপ : নিমগাছ দেখলে সকলেই তার থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে সে ব্যাপারেই সচেষ্ট হয়। কেউ তার ছাল ছাড়িয়ে নেয়, কেউ পাতা তুলে আনে, "কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ..... দাঁত ভালো থাকে।" নিমের হাওয়া ভালো বলে গাছটি কেউ কাটেও না, যত্নও করে না। চারপাশে জমে আবর্জনা। হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এসে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। সে পাতা তুললো না ডাল ভাঙল না, শুধু চেয়ে রইল গাছটার দিকে। তার মনে হল যেন "এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে

এসেছে নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।" এই মানুষটি আর কেউ নয়, কবি। নিমগাছটার ইচ্ছে করল এই মানুষটির সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু মাটির ভেতরে গভীরে তার শিকড় ছড়ানো তাই পারলো না, আর পাশের বাড়ির গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটারও এই দশা।

বিশ্লেষণ—এই ছোটোগল্পটিতে নিমগাছটি সম্পর্কে নানা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—একটির পর একটি বাক্যে। নিমগাছটি তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে শরীরী সত্তা নিয়ে দাঁড়ায় যেন পাঠকের সামনে, কিন্তু এরপর ছোটোগল্পের শেষ বাক্যটি গল্পের সমাপ্তি টেনেছে। সম্পূর্ণ গল্পটি যে নিমগাছ সম্পর্কে; নিমগাছটির পরিপূর্ণতা, অস্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে তা আসলে বাহ্য। নিমগাছটি গল্পকারের বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য নয়, গল্পের শেষ পংক্তিতে যে গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটার কথা বলা হয়েছে সেই হল এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নিমগাছটি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আসলে গৃহকর্মনিপুণা লক্ষ্মী বউটা সম্পর্কেই বেশি সত্য। গল্পের গঠন কৌশলের মূল রহস্যটিই আছে গল্পের অন্তিম বাক্যটিতে, আবার সেটি চমক দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে। যে গৃহবধুকে বর্তমান সমাজে কেউ যত্ন করে না, সেই গৃহবধূটি সবার সেবায় আত্মনিয়োগ করে পরিণামে অবহেলায় অনাদরে ঘরের কোণে পড়ে থাকে, সেই গৃহবধূটিকে প্রশংসা করলেও সে তার কোনো সাড়া দিতে পারে না। সমাজে সংসারে তার শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। অনড় হয়ে সে থাকে পরের সেবায় নিয়োজিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গৃহে নারীর অবস্থানটিও এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পটির পরিণতি মাত্র একটি বাক্যে হয়ে ওঠে গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

৩১০.১.২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নিমগাছ' গল্পটি অণুগল্পের সার্থক প্রকাশ—আলোচনা করো।

২। 'বনফুলের গল্পের গঠনভঙ্গি ভিন্ন মাত্রার'—পঠিত যে কোনো একটি গল্প আলোচনা করে মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা বিচার করো।

৩। বনফুল রচিত 'নিমগাছ'—গল্পটির নামকরণ কতদূর সঙ্গত হয়েছে—তা' পর্যালোচনা করো।

৪। বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পটিকে সার্থক অণুগল্প বলার পক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন করো।

৩১০.১.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাহিত্যে ছোটো গল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। আধুনিক বাংলা ছোটো গল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী।

৩। কালের পুত্তলিকা—অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

একক - ৩

মহানগর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিন্যাসক্রম

৩১০.১.৩.১ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনী

৩১০.১.৩.২ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকর্ম

৩১০.১.৩.৩ : গল্প পরিচয়—মহানগর

৩১০.১.৩.৪ : নামকরণ

৩১০.১.৩.৫ : মহানগর গল্পে কাব্যধর্মিতা

৩১০.১.৩.৬ : চরিত্র পরিচয়

৩১০.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.১.৩.১ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন কল্লোল যুগের একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বাঙালি কবি, ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) হুগলী জেলার কোন্নগরে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে বড় হয়ে উঠেছিলেন। লেখকের পিতার নাম জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মাতার নাম ছিল সুহাসিনী দেবী। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপরে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে কলাবিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে অবশ্য বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন সাউথ সুবার্বান কলেজে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র বন্ধুদের সহযোগিতায় 'আভ্যুদয়িক' নামে একটি সাহিত্যিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র পড়াশোনা করার জন্য কলকাতা শহর ছেড়ে ঢাকা শহরে গিয়েছিলেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে পড়াশোনার জন্য বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। অক্সফোর্ড মিশন ছাত্রাবাসে থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে

শুরু করেন। পরবর্তীকালে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঢাকা শহর ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। সাহিত্যিকরূপে তখন তিনি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখক হিসেবে কাজ করেছেন বেঙ্গল ইমিউনিটিতে। তারপর তিনি প্রবেশ করেছিলেন চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে চোদ্দ বছর বয়সে কিশোরীকন্যা বিভার সঙ্গে লেখকের বিবাহ হয়েছিল। সাহিত্যের জগতের সুনাম হলেও সুনির্দিষ্ট জীবিকার সন্ধান তখনও তিনি পাননি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কন্যার নাম ছিল মাধবী। তাঁর দুই পুত্রের নাম মৃন্ময় ও হিরন্ময়। লেখকের প্রথম স্ত্রী বিভাদেবী মারা যাওয়ার পর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন বীণা বসুর সঙ্গে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার জন্য তিনি আর লেখালেখি করতেন না। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ৩রা মে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করেছিলেন।

৩১০.১.৩.২ : প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাহিত্যকর্ম

কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা পরপর দুটি ছোটগল্প 'শুধু কেরাণী' এবং 'গোপনচারিণী' প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসে। ১৯২৪ খিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'সংহতি' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম উপন্যাস 'পাঁক' প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটির বাকী অংশ পরবর্তীকালে 'বিজলী'(১৯২৪) ও 'কালিকলম' (১৯২৬) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কবিতা সংকলন 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমসাময়িক সাহিত্যিক ছিলেন— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হলো— 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০), 'কখনো মেঘ' (১৯৬১), 'অথবা কিন্নর' (১৯৬৫), 'চাঁদ তারা জোনাকিরা' (১৯৬৭) এবং 'ছড়া যায় ছড়িয়ে' (১৯৮১)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্প, কবিতা রচনার পাশাপাশি সারাজীবন অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'পাঁক' (১৯২৬) উপন্যাসটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা প্রথম উপন্যাস। পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন, সেগুলি হলো— 'মিছিল' (১৯২৮), 'আগামীকাল' (১৯৩০), 'কুয়াশা' (১৯৩০), 'উপনয়ন' (১৯৩১), 'ছায়াতোরণ' (১৯৪১), 'আহুতি' (১৯৪১), 'নতুন খবর' (১৯৪৮), 'সূর্য কাঁদলে সোনা' (১৯৬৯), 'প্রথম বসন্ত' (১৯৭৭) প্রভৃতি উপন্যাস।

কথাসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁর লেখা গল্প—গ্রন্থগুলি হলো— 'পঞ্চশর' (১৯২৯), 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩২), 'মৃত্তিকা' (১৯৩৫), 'অফুরন্ত' (১৯৩৬), 'মহানগর' (১৯৩৭), 'নিশীথ নগরী' (১৯৩৮), 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮), 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪৬), 'সামনে চড়াই' (১৯৪৭), 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫২), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৫৪), 'সপ্তপদী' (১৯৫৫), 'জলপায়রা' (১৯৫৮), 'প্রেমই ধন্বন্তরি' (১৯৫৯), 'সংসার সীমান্তে' (১৯৭৭) প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৫৪), সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার (১৯৫৭), শিশু সাহিত্যের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার (১৯৫৮), ঘনাদা সিরিজের জন্য ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের পেয়েছিলেন 'পদ্মশ্রী পুরস্কার'। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মানিত করেছিলেন সাম্মানিক ডি.লিট উপহার দিয়ে।

সাহিত্যচর্চা ছাড়াও প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেকগুলি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছিলেন। জনপ্রিয় সেই চলচ্চিত্রগুলি হলো— 'কুয়াশা', 'সেতু', 'হানাবাড়ি', 'ডাকিনির চর', 'চুপিচুপি', 'সমাধান', 'বিদেশিনী', 'পথ বেঁধে দিল' প্রভৃতি।

৩১০.১.৩.৩ : গল্প পরিচয়—মহানগর

আমাদের আলোচ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে একটি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের 'মহানগর' গল্পটি 'মহানগর' (১৯৩৭) গল্প গ্রন্থের মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠগল্পে' (১৯৫২) অন্যান্য গল্পের সঙ্গে 'মহানগর' গল্পটি স্থান পেয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে যে গল্পগুলি রয়েছে— সেগুলি হলো— শুধু কেরাণী, পুণ্ণাম, ভবিষ্যতের ভার, হয়তো, সাগর সংগম, মৃত্তিকা, অনাবশ্যক, মহানগর, জনৈক কাপুরুষের কাহিনী, কুয়াশায়, সংসার সীমান্তে, পুনর্মিলন, ভস্মশেষ, শৃঙ্খল, স্টোভ, চিরদিনের ইতিহাস, তেলেনাপোতা আবিষ্কার, ময়ূরাক্ষী, লেভেল ক্রসিং, মল্লিকা, রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন। বাংলা ছোটগল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবস্থান সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন— "প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের প্রতি অসম্ভব মমত্বশীল লেখক। ঘটনাচক্রে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে বলে মানুষকে তিনি কখনও অপরাধী ভাবতে পারেননি। দেহজীবিনিকে সর্বদাই তিনি সম্মান করেছেন।" (ছোটগল্পের বিষয় আশয়—পৃষ্ঠা-১৫৭) সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি লেখকের সহানুভূতি কাজ করেছে। জীবনে চলার পথে গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি মহানগরের জীবনকেও তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। "যেখানে পরিবেশ, পরিস্থিতি নারীকে পতিতা করেছে। নাগরিক কবি হয়েও মনে প্রাণে অ — নাগরিক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতায় বারে বারে নগরজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা যায়।" আমাদের আলোচ্য 'মহানগর' গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে— "আমার সঙ্গে চলো মহানগরে —যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দির-চূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।" গল্পের শুরুতে নাগরিক জীবনের সঙ্গে লেখক গল্পের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—"আমার সঙ্গে এসো মহানগরের পথে, যে— পথ-জটিল,দুর্বল মানুষের জীবনধারার মতো, যে —পথ অন্ধকার, মানুষের মনের অরণ্যের মতো,আর যে- পথ প্রশস্ত, আলোকোজ্জ্বল, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের অদম্য উৎসাহের মতো।" উত্তম পুরুষের জবানিতে জানিয়েছেন— "এ-মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত— ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত।" গল্পের সূচনায় তিনি আরও বলতে চেয়েছেন— "এ — সংগীত

রচনা করার শক্তি আমার নেই। আমি শুধু মহানগরের একটুখানি গল্প বলতে পারি— মহানগরের মহাকাব্যের একটুখানি ভগ্নাংশ, তার কাহিনী— সমুদ্রের দু-একটি ঢেউ। মহাসংগীতের স্বাদ তাতে মিলবে না, তৃষ্ণা তাতে মেটবার নয়, — জানি।" লেখক গল্পটিতে মহানগরের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। মধ্যবিত্ত মানসিকতার মানুষের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে আরম্ভ করেছিল বহুবিধ কারণে। আমাদের আলোচ্য 'মহানগর' গল্পটিতে রতন,তার হারানো দিদির খোঁজে শহরে আসতে বাধ্য হয়েছে। "সে শুধু একবার শহর দেখতে চায়—রূপকথার গল্পের চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কিন্তু শুধু তাই জন্যে কি শহরে আসবার এই ব্যাকুলতা রতনের? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের জীবনসমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবন সবদিক থেকে শূন্যতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র গ্রাম ও শহর জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে সেই সংকটপূর্ণ জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর লেখা বিভিন্ন কথাসাহিত্যের মধ্যে। রতন ও তার দিদি চপলার জীবনের হাহাকার পাঠকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। "তারপর তাদের নৌকা বাঁক নিয়ে ঢুকেছে এই শাখার ভেতর,চলেছে পুরনো শহরতলির ভেতর দিয়ে। বড়ো নদীতে মহানগরের রূপ দেখে রতন সত্যি ভয় পেয়েছিল, হতাশ হয়েছিল আরো বেশি। কিন্তু এই পুরনো জীর্ণ শহরতলি দেখে তার যেন একটু আশা হয়। কেন আশা হয়? আচ্ছা, সে-কথা এখন থাক।"

মানুষের মনোজগৎ রহস্যময়। প্রেমেন্দ্র মিত্র কল্লোলের লেখক হয়ে বিভিন্ন ছোটগল্পে মানব মনস্তত্ত্বের কথাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারফলে গোটা মানুষের মানে খুঁজতেই তিনি একের পর এক জীবনপর্বে অগ্রসর হয়েছেন। আমাদের পাঠ্য 'মহানগর' গল্পে রতন গ্রাম থেকে শহরে প্রবেশ করেছে। "রতন কিন্তু কদমতলায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে থাকবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করে সে তো শহরে আসেনি। সারা পথ সে মনের কথা মনেই চেপে এসেছে। মুখ ফুটে একবার বুঝি লক্ষণকে গোপনে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেছিল— হ্যাঁ কাকা, পোনাঘাটের কাছেই উল্টোডিঙি না?" গ্রাম্যজীবনে বসবাস করে রতন বড় হয়ে উঠেছে। শহর জীবনের সঙ্গে রতনের আগে পরিচয় ছিল না। গল্পে দেখা যায় —"মহানগরের বিশাল অরণ্যে কত মানুষ আসে কত কিছুর খোঁজে ; কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বা বিস্মৃতি। মৃত্তিকার স্নেহের মতো শ্যামল একটি অসহায় ছেলে সেখানে এসেছে কিসের খোঁজে? এই অরণ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষিতকে সে খুঁজে পাবার আশা রাখে— তার দুঃসাহস তো কম নয়।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র শহরে বসবাস করার সময় শহরের অলিতে —গলিতে যে জীবনকে দেখেছেন, সেই জীবনের খণ্ডচিত্রকে তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পটিতে। "রতন ভয়ে ভয়ে বলে ফেলে— সেখানে আমার দিদি থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যায়। লোকটি যদি আরও কিছু জিজ্ঞাসা করে, যদি ধরে নিয়ে যায় আবার তার বাবার কাছে।" তাহলে রতন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। তখন তার জীবনে নেমে আসবে ঘোর অন্ধকার। ছোট থেকেই দিদি ও ভাইয়ের সম্পর্কের বন্ধন অটুট ছিল। পারিবারিক জীবনে তারা সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বড় হয়ে উঠতে চেয়েছে। অর্থনৈতিক হাহাকারের জন্য রতনের

দিদি চপলা কোথায় হারিয়ে গেছে। এমনকী সামাজিক সংকটের কারণে দিদি বাধ্য হয়েছে গ্রাম থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে। "রতন এসেছে দিদিকে খুঁজতে। যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে হারিয়ে খুঁজে পায় না, সেই মহানগর থেকে তার দিদিকে সে খুঁজে বার করবে। শহর মানে তার দিদি। বাড়িতে থাকতে সে ভেবেছে শহরে গেলেই বুঝি দিদিকে পাওয়া যায়। মহানগরের বিরাট রূপ তার সে — ধারণাকে উপহাস করেছে; কিন্তু তবু সে হতাশ হয়নি। দিদিকে খুঁজে সে পাবেই। শিশু — হৃদয়ের বিশ্বাসের কি সীমা আছে।"

পরিবেশ-পরিস্থিতি বাধ্য করেছে চপলার মতো মানুষকে পরিবার ছেড়ে এতো দূরে বসবাস করতে। সামাজিক সংকট ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে চপলার মতো অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে। "দিদিকে যে তার খুঁজে বার করতেই হবে। দিদি না হলে তার যে কিছু ভালো লাগে না। ছেলেবেলা থেকে সে তো মাকে দেখেনি, জেনেছে শুধু দিদিকে। দিদি তার মা, দিদিই তার খেলার সাথী। বিয়ে হয়ে দিদি গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ী। তবুও তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কাছাকাছি দুটি গাঁ, রতন নিজেই জখন-তখন পালিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছে দিদির কাছে। তারপর দিদির কাছ থেকে তাকে নিয়ে আসা সোজা ব্যাপার নয়। দিদি যেখানে থাকতে পারে দিনের পর দিন, সেখানে তার বেশি দিন থাকা কেন যে দোষের তা সে কেমন করে বুঝবে।" রতন এই পরিস্থিতিতে কি করে থাকবে। তার জীবনের পথ ও মসৃণ নয়। "তারপর কি হল কে জানে। একদিন তাদের বাড়িতে বিষম গণ্ডগোল। দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক এসেছে ভিড় করে, ভিড় করে এসেছে গাঁয়ের লোক। থানা থেকে চৌকিদার পর্যন্ত এসেছে। ছেলেমানুষ বলে তাকে কেউ কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তবু সে শুনেছে- দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তাকে আবার কেড়ে আনলেই তো হয়। কেন যে কেউ যাচ্ছে না তাই ভেবে তার রাগ হয়েছে। তারপর সে আরো কিছু শুনেছে; শিশুর মন অনেক বেশি সজাগ। দিদিকে কোথায় ধরে নিয়ে গেছে কেউ নাকি জানে না।" পরিবারের লোকজন রতনকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু রতন কথা শোনেনি। দিদি ও ভাইয়ের স্নেহের সম্পর্ককে কোন পরিস্থিতিই বাধা দিতে পারেনি। "কিন্তু কেমন করে সে জানবে দিদি কোথায় আছে। কেউ যে তাকে দিদির কথা বলে না। দিদির কথাই যে বলতে নেই। রাত্রে সে চুপিচুপি শুধু দিদির জন্য কাঁদে; দিদি কেমন করে তাকে ভুলে আছে ভেবে মনে-মনে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। দিদি কোথায় থাকে সে জানে না।" মহানগরের নাগরিক চেতনা রতনের পক্ষে জানা খুবই কষ্টের। তবুও সে নাছোড়বান্দা। কার কাছ থেকে রতন শুনেছে দিদি উল্টোডিঙিতে থাকে। "শিশু অনেক কিছু শুনতে পায়, অনেক কিছু বোঝে। কোথা থেকে সে শুনেছে কে জানে যে, দিদি থাকে শহরে- রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত সেই শহর। কোথা থেকে কার মুখে শুনেছে— উল্টোডিঙির নাম। বাতাসে কথা ভেসে আসে, বিনিদ্র ভালোবাসা কান পেতে থাকে, শুনতে পায়।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পটিতে দেখাতে চেয়েছেন নাগরিক পরিবেশে বহুবিধ সমস্যার পরেও মানুষের স্বপ্ন কিভাবে বেঁচে থাকে। গল্পের নায়ক রতনের মনেও আশা বেঁচে রয়েছে। দিদি-ভাইয়ের ভালোবাসার বন্ধন নাগরিক পরিবেশে নষ্ট হয়ে যায়নি। "দিদিকে সে খুঁজে বার করবে, সে জানে দিদির সামনে একবার গিয়ে দাঁড়ালে সে আর না এসে থাকতে কিছুতেই পারবে না। এমনি গভীর তার বিশ্বাস।" দুজন। দুজনকে কাছে পেয়ে যেমন মনের কথা বলেছে, তেমনি পরস্পরের ভালোবাসারও প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

"মহানগরে অনেকেই আসে অনেক কিছুর খোঁজে, কেউ অর্থ, কেউ যশ, কেউ উত্তেজনা, কেউ বিস্মৃতি, কেউ আরও বড়ো কিছু। সবাই কি পায়? পথের অরণ্যে তারা হারিয়ে যায়। মহানগর তাদের চিহ্ন দেয় মুছে। রতনও তেমনি হারিয়ে যাবে ভেবে আমরা তাকে ছেড়ে দিতে পারি।"

আমাদের পাঠ্য 'মহানগর' গল্পে রতন হারিয়ে যায়নি। সে ভালোবাসার জোরে তার দিদিকে খুঁজে পেয়েছিল। "পৃথিবীতে কি সম্ভব, কি অসম্ভব কে বলতে পারে? রতন সত্যি দিদির খোঁজ পায়। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে বিকেলের দিকে। আষাঢ় মাসের আকাশ, মেঘে ঢাকা বলে বেলা বোঝা যায় না। ক্লান্তপদে শুকনো কাতরমুখে একটি ছেলে গিয়ে দাঁড়ায় খোলায় — ছাওয়া একটি মেটেবাড়ির দরজায়। একটি মেয়ে তাকে রাস্তা থেকে এনেছে সঙ্গে করে।" নাগরিক পরিবেশে রতন সরল মন নিয়েই সবকিছু দেখার চেষ্টা করেছে। দিদি-ভাইয়ের ভালোবাসার বন্ধন শেষ পর্যন্ত চপলার খোঁজ পেয়েছে। বহুবিধ সংকটে আবদ্ধ হলেও চপলা, ভাইকে দেখে চিনতে পেরেছে। মানবিকতার জোরে চপলা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রতনকে চিনতে পেরে কাছে টেনে নিয়েছে। "উত্তর না দিয়ে চপলা হঠাৎ ছুটে এসে রতনকে বুকে চেপে ধরে, তারপর এদিক ওদিক চেয়ে অবাক হয়ে ধরা গলায় বলে- তুই একা এসেছিস।"

আমরা সকলেই জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মধ্যবিত্ত জীবনে বহুবিধ সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তারফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। সাধারণ মানুষও পারিবারিক হাহাকারের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করে সেইসময় সাহিত্য রচনা করেছেন। নাগরিক পরিবেশে কালোবাজারী-মজুতদারীর সঙ্গে মানুষের জীবনের হাহাকারের চিত্রও গল্পটিতে তুলে ধরেছেন। "মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব- কিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।" আলোচ্য গল্পে গল্পকার মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসংকট তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেইসঙ্গে চপলার জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। নাগরিক পরিবেশে চপলার জীবনে অর্থনৈতিক হাহাকার নেই, তার প্রমাণ চপলার ঘরের নানারকম আসবাবপত্র ও বিলাস সামগ্রী দেখে আমরা বুঝতে পারি। শহরের পরিবেশে চপলার জীবন ধারণের জন্য মাটির ঘরও যে টাকার জন্য সাজানো —গোছানো হতে পারে। চপলার জীবন ধারণ পদ্ধতি দেখে রতন অবাক হয়ে গেছে। গ্রাম থেকে উঠে আসা দিদির জীবনের পরিবর্তন দেখে শেষ পর্যন্ত রতন ঐ পরিবেশে থাকবে বলে মনস্থির করে ফেলেছে। তখন চপলা, রতনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "মাথা নিচু করে ধরা গলায় বলে— এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই। রতন কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এবার তার অত্যন্ত অভিমান হয়। দিদি সেখানেও যেতে পারবে না, আবার এখানেও বলবে তাকে থাকতে নেই। আচ্ছা, সে চলেই যাবে। কখখনো, কখখনো আর দিদির নাম করবে না, বাবার মতো।"

নাগরিক পরিবেশে থেকে চোখে রঙিন চশমা পরে চপলা ভুলে গেছে নিজের জীবনের অতীত কাহিনী। তারও যে পরিবার ছিল, পারিবারিক নিয়ম-কানন মেনে সে বড় হয়ে উঠেছিল। সামাজিক সংকটের কারণে সেই পরিবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য চপলা আর সেই অতীত জীবনে ফিরে যেতে রাজী নয়। কেননা

মহানগরে বসবাস করার সময় থেকে ভুলে গেছে অতীত জীবন। রতনকে তাই বারবার করে চপলা বলেছে আর সেই জীবনে ফিরে না আসার জন্যে। যে পরিবারে চপলার কপাল ভেঙ্গেছে, সেই জীবনে সে আর কোনভাবেই ফিরতে রাজী নয়। চপলার জীবনের সব আশা চুরমার করে দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। অতীতের সেই জীবনের হারকে মেনে নিয়ে চপলা বাকী জীবন মহানগরের পরিবেশে কাটিয়ে দিতে চায়। "চপলা তখনো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রতন তার কাছে এসে হঠাৎ বলে— বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না।" গল্পটা আরো কিছু দূর অগ্রসর হতে পারতো, কিন্তু গল্পের নামকরণ যে 'মহানগর'। তাই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মহানগরের জীবন পরিবেশে সাধারণ মানুষের অসহায়তা, জীবনসংকটকে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন। গল্পের নায়ক রতনকে নাগরিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমাদের আলোচ্য 'মহানগর' গল্পের নায়িকা চপলা। একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়ে নিপাট সাধাসিধে সাধারণ মেয়ে হয়েও সামাজিক সংকটের কারণে চপলাকে বাকি জীবনটা মহানগরে কাটাতে হয়েছে। কেননা রতনের দিদিকে কারা গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে গেছে, তা সে জানতে পারেনি। সে নিজের চেষ্টাতেই দিদির খোঁজ পেয়েছে। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র আলোচ্য গল্পের শেষে বলেছেন- "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।" এক সরল শিশুর জীবন জিজ্ঞাসা মহানগরের বহুবিধ সমস্যাজনিত জীবনে কোনো প্রভাব পড়েনি কিন্তু গল্প পাঠকেরা লেখকের জীবন জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছে বলে আমাদের মনে হয়।

৩১০.১.৩.৪ : নামকরণ

আমরা সকলেই জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক ভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। সমাজের প্রতিটি শ্রেণীই একে-অপরকে টেক্কা দিয়ে সমস্ত সুবিধা ভোগ করতে চেয়েছে। সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মানুষ নিজের নাম- যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, কামনা-বাসনার চেষ্টায় মত্ত থেকেছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পের শুরুতেই সেই নগরজীবনের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন— "আমার সঙ্গে চলো মহানগরে— যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো, আবার যে মহানগর উঠেছে মিনারে মন্দির চূড়ায়, আর অভ্রভেদী প্রাসাদ শিখরে তারাদের দিকে, প্রার্থনার মতো মানবাত্মার।" তখনই আমরা বুঝতে পারি প্রেমেন্দ্র মিত্র মহানগরের গল্প শোনাতে বসেছেন। তিনি আরও বলেছেন — "এ মহানগরের সংগীত রচনা করা উচিত — ভয়াবহ, বিস্ময়কর সংগীত"। পরে আমরা গল্প পাঠ করে জেনেছি, লেখক বলেছেন — "এ — সংগীত রচনা করার শক্তি আমার নেই"। গল্পকার বালক রতনকে সামনে এনে নিজে সরে গেছেন পর্দার আড়ালে। 'মহানগর' গল্পটি রতন ও তার দিদি চপলার জীবন সংকটের কাহিনী হলেও আসলে মহানগরই এ গল্পের মূল পরিচালন শক্তি।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধ্রুব পদের মতো 'মহানগর' শব্দটি বারবার লেখক ব্যবহার করেছেন। মহানগরের জটিল, অমানবিকতার

জীবন চিত্র গল্পের পটভূমি এবং মর্মবাণীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। পোনাচারার নৌকায় উঠে কিশোর রতন এসেছে মহানগরে। উল্টোডিঙিতে তার হারানো দিদি চপলার খোঁজে। রহস্যময় অন্ধকারের গোলোকধাঁধায় পড়ে মানবিকতা হাহাকার করে তার চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন প্রতীক ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। গল্পে দেখা যায় — "কদমগাছ থেকে অসংখ্য ফোটা ফুল ঝরে পড়েছে মাটিতে। কাদায় মানুষের পায়ের চাপে রেণুগুলো থেঁতলে নোংরা হয়ে গেছে। পোনা — চারার হাটে কদমফুলের কদর নেই।" আলোচ্য গল্পে তারই নির্মম ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি লেখক তুলে ধরেছেন।"মহানগরের পথে ধুলো, আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ। আমাদের আশা এখানে কখনো-কখনো পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে। তবু বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিস্বাদ লাগে। মহানগর সব- কিছুকে দাগী করে দেয়, সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।" মহানগরের কোলাহলমুখর জীবনকে লেখক পর্যবেক্ষণ করেছেন। ব্যঞ্জনাগর্ভ বাক্যাবলী গল্পের কাহিনি বিস্তারে অন্যমাত্রা এনে দিয়েছে। রতন নামে একটি গ্রাম্য বালকের গ্রাম থেকে শহরে আসার মধ্য দিয়ে বহুবিধ জীবনসমস্যাকে লেখক গল্পটিতে তুলে ধরেছেন। আবার রতনের দিদি চপলার জীবন সমস্যার মধ্য দিয়ে মহানগরের রহস্যময় অন্ধকারকে লেখক তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন- "মহানগরের ধূসর অমানবিকতা, জটিলতা ও বিষাক্ততার প্রথম পরিচয় বাংলা ছোটগল্পে পাওয়া গেল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পে। একটি গ্রাম্য বালকের অভিভূত দৃষ্টিতে মহানাগরিক জীবনের বিকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।" (পৃষ্ঠা-১৯১) সুতরাং আলোচ্য গল্পের নামকরণ 'মহানগর' সব দিক দিয়ে সার্থক তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না।

৩১০.১.৩.৫ : মহানগর গল্পে কাব্যধর্মিতা

আমরা সকলেই জানি, কবিতা এবং ছোটগল্প সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে ব্যঞ্জনা লক্ষণীয় বিষয়। বেশি কথা বলার জায়গা নেই বলে ছোটগল্পকারকে প্রতীকের বা ব্যঞ্জনার সাহায্য নিতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে উপমা, চিত্রময়তা, বর্ণময়তার সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। লেখকের নিপুণ রচনা কুশলতার প্রয়োগে গল্পটি রসাত্মক হয়ে উঠেছে। 'বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয় গ্রন্থে' — তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "যার লেখায় কবিসত্তা আর বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা মিশে গেছে। সব গল্পকারই চেয়েছেন মানুষের কথা বলতে। শুধু দেখার ভিন্নতা, উপস্থাপনের স্বাতন্ত্র্য তাঁদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে। মধ্যবিত্ত মানুষের হাসিকান্না, নগর জীবনের ক্লেদ, সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং স্বপ্ন ও স্বপ্নভাঙার আর্তনাদে ভরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প।" (পৃষ্ঠা-৪৮) আমাদের পাঠ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে— "আমার সঙ্গে চলো মহানগরে— যে মহানগর ছড়িয়ে আছে আকাশের তলায় পৃথিবীর ক্ষতের মতো।" এই উক্তিটিতে পৃথিবীর ক্ষতের মতো বাক্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমালোচক তরুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ গল্পের প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমাণ করেছেন, তিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার। তাঁর গল্পে যেমন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত জীবনের ছবি পাই, তেমনি পাই এক কবির মনকে। যিনি শুধু গল্প বলেন না, গল্পকে শিল্পরূপময় করে তোলেন। আনেন প্রতীকী ব্যঞ্জনা। মনের বিসর্পিল ও অন্ধকার কোণকেও নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেন। অথচ

কল্লোলীয় মেজাজ অনুসারে তথাকথিত যৌনতাকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁর গল্পে যে ভাষাভঙ্গি, চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদি পাই তা-ও নানা রঙে বোনা।" (পৃষ্ঠা-৫৬)

অন্ধকারের গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। "প্রিয়ার মতো যে নদী শুয়ে আছে মহানগরের কোলে, তার জলের ঢেউ-এর সুর, আর নগরের ছায়াবীথির ওপর দিয়ে যে হাওয়া বয় তার, নির্জন ঘরে প্রেমিকেরা অর্ধস্ফুট সে কথা বলে তারও। সে সংগীতের মাঝে থাকবে উত্তেজিত জনতার সম্মিলিত পদধ্বনি।" আধুনিক সমাজের বহুবিধ সংকটকে গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র সুনির্বাচিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে গল্পটিতে তুলে ধরেছেন।

ইমেজ বা চিত্রকল্প রচনায় রূপদক্ষ কবি-গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মহানগরের ধূসর জটিলতা ও কালো ধোঁয়ার জীবনের সঙ্গে মানুষের বিপন্নতাকে তুলে ধরেছেন। গল্পে দেখা যায়— "কঠিন ধাতু ও ইটের ফ্রেমে লক্ষ জীবনের সূত্র নিয়ে মহানগর বুনছে যে বিশাল সূচিচিত্র, যেখানে খেই যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে, উঠছে জড়িয়ে নতুন সুতোর সঙ্গে অকস্মাৎ — সহসা যাচ্ছে ছিঁড়ে — সেই বিশাল দুর্বোধ চিত্রে অনুবাদ থাকবে সে— সংগীতে।"

প্রেমেন্দ্র মিত্রের অধিকাংশ গল্প ব্যঞ্জনাধর্মী, গভীর ইংগিতবহ। গল্পকার মানুষের কামনা-বাসনা, দুঃখ-সুখ, ভোগ বিলাসিতা, যৌনতা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন বিভিন্ন গল্পে। পাখীর নীড় (শুধু কেরাণী), ভাঙ্গাবন্দর (মহানগর), আগুন (ভস্মশেষ), ট্রেন (যাত্রাপথ) প্রভৃতি প্রতীক তিনি বাস্তবজীবনের প্রেক্ষিতে অঙ্কণ করেছেন।

'মহানগর' গল্পে পুরনো ভাঙাখাট, ইটখোলা, চালের আড়ত, কেঠোপটি, পাজাটালি,ইট,সুরকি, বালি, আবার অন্যপ্রান্তে সদাগরী জাহাজের খুব কাছেই জেলে ডিঙি, খেয়া নৌকা,স্টিমার, লঞ্চ, মহানগরের মহাকাব্যের প্রতি চিত্রকে নির্মিত করেছে। 'মহানগর' গল্পে দেখা যায়, এখানে উপস্থিত বহু মানুষ প্রচুর পরিশ্রম করে নিজের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলেছে। কেউ কেউ আবার রঙিন চশমা পরে সব কিছু রঙিন দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে গেছে। সেই দলের মানুষেরা বিনা পরিশ্রমে সার্থকতার মুখ দেখতে চায় বলে,তাদের এই পরিণতি। মহানগরের রাজপথে বিভিন্ন যন্ত্রের শব্দে মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। আবার প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটিকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন। সর্বোপরি গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র 'মহানগর' গল্পে প্রতীকের ব্যবহারে মহানগরের দুটি বিপরীতমুখী চিত্র অঙ্কন করেছেন। সমালোচক হীরেণ চট্টোপাধ্যায় 'সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য' গ্রন্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্প সম্পর্কে বলেছেন— "বোঝা যাচ্ছে বাহ্যিক শোভা বৃদ্ধির জন্য নয়, আঙ্গিক চমৎকারিত্বের জন্যও নয়- গল্পের ব্যঞ্জনা এবং মাত্রা বৃদ্ধির জন্যই ভিন্নতর উপস্থাপনা প্রেমেন্দ্র মিত্র পছন্দ করেছেন। একটি গ্রাম্য কিশোরী বধূর পতিতা বৃত্তি গ্রহণের মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের কাছে স্মরণীয় করবার জন্যই গল্পের পরিবেষণ কৌশল পরিবর্তিত করেছেন।" (পৃষ্ঠা-১৪৫)

ক) পৃথিবীর ক্ষতের সঙ্গে মহানগরের তুলনা, পরিবেশগত তীব্র দূষণ ও যান্ত্রিকতাকে স্মরণ করায়।

খ) দুর্বল মানুষের জীবনধারার মত জটিল পথ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ মানুষের মনের অরণ্যের মত মনে করিয়ে দেয় জটিল মনস্তত্ত্ব।

গ) তৃতীয়ত সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মত গাঢ় রতনের প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিষন্নতা সন্ধ্যার রূপ কল্পে তাৎপর্য পায়।

ঘ) রূপকথার চেয়ে অদ্ভুত শহর। রূপকথার উপমাও বৈচিত্র্যকে মনে করিয়ে দেয়।

ঙ) বিশাল দুর্বোধ চিত্র স্মরণীয় হয়ে ওঠে মহানগরের চরিত্রগত জটিলতায়।

চ) 'মহানগর' গল্পে রতন দু'চোখ দিয়ে পান করেছে 'আলোক ছিটানো এই অন্ধকার'।

'মহানগর' গল্পে — "পোনাচারার হাটে কদমফুলের কদর নেই' বাক্যটি যে চিত্রকল্প রচনা করে, তা মানুষের পায়ের চাপে থেঁতলে যাওয়া কদম্বরেণু- যা চপলার জীবন সংকটের পরিচয় প্রকাশ করেছে। "দিদিকে কারা নাকি ধরে নিয়ে গেছে" — বাক্যটিতে 'নাকি' সংশয়বাচক শব্দটি গল্প পাঠককে ধন্দে ফেলে দেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পের গঠনকৌশল তাঁর কবিতার মতোই সংযত। অত্যন্ত সংযত সুমিত ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাহিনির ভাবপরিমণ্ডল রচনা করা হয়েছে। গল্পের বর্ণনা গদ্যকবিতার মতো। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দ প্রয়োগে গল্পকারের নিপুণ জীবনবোধ ও শিল্পবোধের সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩১০.১.৩.৬ : চরিত্র পরিচয়

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। সেই জীবনকেই তিনি দেখিয়েছেন তাঁর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মহানগর' গল্পের নায়ক চরিত্র রতন। রতনের দিদি চপলা। তাছাড়াও গল্পের কাহিনি প্রসঙ্গে রতনের বাবা মুকুন্দের কথা এসেছে। পোনাঘাটের নৌকায় মুকুন্দের সঙ্গী লক্ষণেরও পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'মহানগর' গল্পে রতন ও তার দিদি চপলার জীবন সুচারুভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন। "রতন নামে একটি বালকের চোখে দেখা মহানগরের গল্প, যে গ্রাম থেকে এসেছে তার নিরুদিষ্ট দিদি চপলাকে খুঁজতে।"

গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র মানব প্রেমিক জীবন শিল্পী। মানব জীবনের রূপ সৃষ্টিতে অন্যান্য গল্পকারদের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমাদের আলোচ্য গল্পে রতনের দিদি চপলার জীবন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। রতনের দিদি চপলা পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছে সে কথা বুঝতে গল্প পাঠকদের একটু সময় লেগেছে। রতনের দিদি চপলা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণে গ্রামছাড়া। গ্রাম থেকে চলে আসার পর সে স্থান পেয়েছে মহানগরে। বিপন্ন তরুণীকে সেই গ্রাম আর আশ্রয় দেয়নি, শহরেই সে শেষ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে।

চপলার ঘর দেখে রতন অবাক হয়ে গেছে। "মাটির ঘর এমন করে সাজানো হতে পারে, এত সুন্দর জিনিস সেখানে থাকতে পারে রতন তা কেমন করে জানবে? এত জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে প্রথম— এসব তোমার দিদি?"

রতন এসেছে তার দিদিকে মহানগরের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার হয়ে চপলা পতিতা বৃত্তি ত্যাগ করে ফিরে যেতে পারেনি স্বাভাবিক জীবনে। সংকটময় পরিস্থিতিতে চপলা কাতর মুখে বলেছে— "আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই। যাবার উপায় নেই। রতনের মুখের সব দীপ্তি হঠাৎ নিবে যায়।" সঙ্গে সঙ্গে রতনের মনে পড়ে যায় দিদির প্রতি বাবার রাগের কারণ। রতন মনে করেছে বাড়িতে দিদির নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা নিষেধ। সত্যিই বুঝি দিদির বাপের বাড়ি ফিরে যাবার উপায় নেই। তাহলে কি রতন বৃথা পরিশ্রম করে দিদিকে খুঁজতে শহরে এসেছে। অনেক পরিশ্রমের পর দিদিকে খুঁজে পেয়েও তার মন খারাপ। সেইপরিস্থিতিতে "মাথা নিচু করে চপলা ধরা — গলায়- বলে- এখানে যে তোমার থাকতে নেই ভাই।" রতন এসেছিল দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে মহানগরের বহুবিধ যন্ত্রণা থেকে। রতনের মনে হয়েছে, দিদি শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতেও পারবে না, আবার আমাকেও তার সঙ্গে থাকতে দেবে না। দিদি দুইয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে তার জীবনকে আরো সংকটময় করে তুলেছে। সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিক মানুষদের মতো দিদির কথা আর ভাববে না বলে রতন অভিমান করেছে। বাবার উল্টো পথের পথিক হয়ে রতন বরঞ্চ দিদির কথা মনে রাখবে। চপলাকে মহানগরের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেনি বলে রতনের মনেও আত্মিক সংকট দেখা দিয়েছে। "বড়ো হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাব দিদি। কারুর কথা শুনব না। বলেই সে এবার সোজা এগিয়ে যায়। তার মুখে আর নেই বেদনার ছায়া, তার চলার ভঙ্গি পর্যন্ত সবল; এতটুকু ক্লান্তি যেন তার আর নেই।" গল্পকার মহানগরের গভীর অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখলেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় আত্মীয়তার সম্পর্ক। প্রতিবেশী হিসেবে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে আমরা আশা করতে পারি। আমাদের দেশের হাজার হাজার নারীদের এমন দুর্দশার কাহিনি সাহিত্যের পাতায় চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যায়। যারা এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেনি,মুখ বুজে সব কিছু সহ্য করে গেছে। আমাদের পাঠ্য গল্পের চপলাও হতভাগিনী নারীদের মধ্যে একজন। 'বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' গ্রন্থে,বীরেন্দ্র দত্ত বলেছেন- মহানগর গল্পে রতন ও রতনের দিদির মহত্তম মানবিক সম্পর্কের মধ্যে নগরজীবনের অভিশাপ হয় সভ্যতারই সৃষ্ট দালালদের বিপুল লাভের কলঙ্কিত মূলধন।" (পৃষ্ঠা-৬৯৫)

৩১০.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মহানগর গল্পের নামকরণ কতখানি সার্থক, নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

২। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মহানগর গল্পের পটভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৩। মহানগর গল্পের প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে নিজের ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। ছোটগল্প হিসেবে 'মহানগর' গল্পটির শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করো।

৫। চরিত্র বিশ্লেষণ করো— চপলা ও রতন।

৩১০.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প।

২। ছোটোগল্পে স্বদেশস্বজন — অলোক রায়।

৩। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (প্রথম খণ্ড) — বীরেন্দ্র দত্ত।

৪। বাংলা ছোটগল্পের দিগ্বলয় — তরুণ মুখোপাধ্যায়।

৫। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

একক - ৪

গা মানুষ জাতির কথা

রাজশেখর বসু

বিন্যাসক্রম

৩১০.১.৪.১ : লেখক পরিচিতি—রাজশেখর বসু

৩১০.১.৪.২ : গা মানুষ জাতির কথা

৩১০.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.১.৪.১ : লেখক পরিচিতি—রাজশেখর বসু

বিজ্ঞানী রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) বাংলা গল্পের রসনির্মাণে বিশিষ্ট ব্যঙ্গ কৌতুক উইটের মিশ্রণে নিজের সৃজনশীল ভাষায় এক অসামান্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি ভাষাবিদ—অভিধান রচনা করেছেন, মূল সংস্কৃত থেকে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন—আবার হাস্যরসাত্মক গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত।

চিকিৎসা সঙ্কট এবং গা মানুষ জাতির কথা দুটি গল্প একটি হাস্যকৌতুক রচনার অন্যতম উদাহরণ, অন্যটি বিজ্ঞানকল্প কাহিনী। পরশুরাম সমকালীন শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের উদ্দেশ্যে গল্পরচনা করেছেন, শিক্ষিত যুবকদের মনে যে আলস্য জড়তা এবং দৈবানুরাগ তৈরি হয়েছিল তাকে ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন, ব্যঙ্গের অন্যতম বাহন ভাষা, এবং সরস ব্যঙ্গরচনায় পরশুরাম অদ্বিতীয়।

৩১০.১.৪.২ : গা মানুষ জাতির কথা

কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে সমাজমনস্ক লেখকের অসামান্য কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি এই গল্পটি। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৮-এ লেখা এই গল্পটির মধ্যে যে আগামী জীবনের সম্ভাবনার কথা লিখেছেন তা এখন ঘটমান জগতের সঙ্গে অনেকটাই মেলে।

কাহিনী সংক্ষেপ : অ্যানাইহিলিন বোমার বিস্ফোরণে মানব সভ্যতা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হল তখন সমগ্র সৃষ্টি — কীট পতঙ্গ গাছপালা সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। বড়ো বড়ো শহরের রাস্তার নীচে গভীর ড্রেনে যে ইঁদুরেরা বাস করতো বোমা থেকে নির্গত গামারশ্মির প্রভাবে তারা সহজাত প্রখর বুদ্ধি এবং ত্বরিত উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে ধরাতলে গামানুষ অর্থাৎ গামা মানুষ হয়ে উঠল। সেই সমাজে ও বিশ্বশান্তি সম্মেলনের আয়োজন খাতে

সৃষ্টি আর ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। সেই সম্মেলনে পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলি থেকে যাঁরা প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ভৃঙ্গারাজনন্দী, তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত ভেরাসিটিন ইঞ্জেকশন দিয়ে সত্যভাষণে বাধ্য করেন। তাতে তাঁদের প্রকৃত অভিসন্ধি ধরা পড়ে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকেই অন্যকে বঞ্চিত করে সমৃদ্ধ হতে চায় এবং সেই কথা প্রকাশ হতেই মূল উদ্দেশ্য যে, অন্যকে ধ্বংস করার জন্য বোমা তৈরি তাও জানাজানি হয়ে যায়। সকলেই যখন বোমাটিকে আয়ত্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগেন তখনই বোমাটির বিস্ফোরণ হয়। "কোনও আওয়াজ কানে এল না, কোনও ঝলকানি চোখে লাগল না, শব্দ আর আলোকের তরঙ্গ ইন্দ্রিয়দ্বারে পৌঁছবার আগেই সমগ্র গামানুষ জাতির ইন্দ্রিয়ানুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল।" গল্পের পরিণতিতে গল্পকার এই আশা ব্যঞ্জিত করেছেন যে আবার একদিন পৃথিবী ফুলে ফলে সম্পূর্ণতা পাবে "সুপ্রজাবতী হবার আশায় ধরণী বারবার গর্ভধারণ করবেন।"

সামাজিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। যে সময়ে এটি লিখেছেন গল্পকার তখনও জাপানের বুকে প্রথম আণবিক বোমাটি বিস্ফোরিত হয়নি, তখন এই সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এবং তখন নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির আণবিক শক্তির জন্য সাহায্য প্রার্থনা প্রভৃতি নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাতে আজও পরশুরাম সমান প্রাসঙ্গিক।

ব্যঙ্গরূপক হিসেবেও গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি। হাস্যরস পরিবেশনে, পরিস্থিতি নির্মাণ কৌশলেও পরশুরাম অদ্বিতীয়। সমাজ সংশোধনের এবং লোভ নিবৃত্ত করার জন্য অবলদাসজীর মতো সৎ পথে চলাই লেখক প্রদর্শিত পথ। গল্পটির মধ্য দিয়ে আসন্ন ধ্বংসের ভয়ঙ্কর যে পরিণামকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন পরবর্তীকালে তা সত্যরূপে নিয়ে দেখা দিয়েছে। ভূয়োদর্শী লেখক পরশুরামের সম্পূর্ণ পরিচয় জানতে গেলে এ গল্পটি অবশ্যই পাঠ করতে হবে। তিনি যখন গল্পটি লেখেন তখনও আণবিক বোমায় ক্ষতির ভয়ঙ্কর উদাহরণ হিরোসিমা, নাগাসাকির অভিজ্ঞতা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারেনি।

৩১০.১.৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্পের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিতে মানব সভ্যতার ধ্বংসের যে কথা পরশুরাম বলেছেন তা আলোচনা করো।

২। ''রাজশেখর বসুর কৌতুকের ভিত্তি ব্যঙ্গ, কিন্তু বাচন ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য তাঁর আঘাতের সূক্ষ্মতা অজস্র হাস্যে রূপান্তরিত"–সমালোচকের এই মন্তব্য কতখানি গ্রহণযোগ্য 'গা মানুষ জাতির কথা' গল্প অবলম্বনে তা ব্যক্ত করো।

৩১০.১.৪.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাহিত্যে ছোটোগল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

২। ছোটোগল্পের কথা — রথীন্দ্রনাথ রায়

৩। বাংলা ছোটোগল্প — শিশিরকুমার দাশ

৪। বাংলা ছোটোগল্প ও গল্পকার — ভূদেব চৌধুরী

পর্যায়গ্রন্থ - ২

একক - ৫

রস

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বিন্যাসক্রম :

৩১০.২.৫.১ : লেখক পরিচিতি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
৩১০.২.৫.২ : গল্প পরিচয়—রস
৩১০.২.৫.৩ : রস গল্পের চরিত্রসৃষ্টি
৩১০.২.৫.৪ : নামকরণ
৩১০.২.৫.৫ : গল্পভাষা
৩১০.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী
৩১০.২.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.২.৫.১ : লেখক পরিচিতি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা কথাসাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যজগতে তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯১৬, খ্রিঃ ৩০শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লেখকের জন্মস্থান বাংলাদেশের ফরিদপুরের সদরদিতে। পিতা–মহেন্দ্রনাথ মিত্র ও মাতা–বিরাজবালা দেবীর সন্তান ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিঃ শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী শোভনাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ভাঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন। তিনি আই-এ পাশ করেছিলেন ফরিতপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে। পরবর্তীকালে তিনি বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় আসার পর নরেন্দ্রনাথ মিত্র বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন। প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কবিতা লিখতেন, তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতার নাম 'মূক'। প্রথম মূদ্রিত গল্প 'মৃত্যু ও জীবন' (১৯৩৬)। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম গল্প সংকলন 'অসমতল' (১৯৪৫)। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা গল্পগ্রন্থগুলি হল –'হলদেবাড়ি' (১৯৪৫), 'সেতার' (১৯৪৫), 'বিদুৎলতা' (১৯৪৫), 'উল্টোরথ' (১৯৪৬), 'পতাকা' (১৯৪৭), 'চড়াইউৎরাই (১৯৫০) ইত্যাদি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা প্রথম উপন্যাস 'হরিবংশ'। এরপর একে একে লিখলেন 'দীপপুঞ্জ', 'চেনামহল' 'দেহমন' 'দূরভাষিনী', 'সঙ্গিনী', 'অনুরাগিনী', 'সহৃদয়া', 'চোরাবালি', 'তিনদিন তিনরাত', 'শিখা', অনাত্মীয়া, সিঁদূরে মেঘ' ও 'নির্বাসন' প্রভৃতি উপন্যাস।

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ খ্রিঃ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় আবু সয়ীদ আইয়ুব একটি নিবন্ধে লিখেছেন – ''নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বিকল্প' গল্পটিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বড় গল্পের পর্যায়ে উত্তীর্ণ বলে চিহ্নিত করেছেন।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তুলনা করেছেন সমালোচকেরা।

দু'জন কথাশিল্পীর মিল দেখা যায় মনস্তাত্ত্বিক চুলচেরা বিশ্লেষণে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানুষের স্বভাব-চরিত্র মনোলোকে কি প্রভাব নিয়ে আসে, সেই দিকটার প্রতি আলোকপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ডঃ সরোজমোহন মিত্র তাঁর 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' গ্রন্থে বলেছেন — ''নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে তারই প্রাধান্য।''

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক অন্যতম কথাসাহিত্যিক হলেন — নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুবোধ ঘোষ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ। এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছেন। সমসাময়িক গল্পকাররা কথাশিল্পী হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের ভুবনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। সমকালীন গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে বলেছেন — ''গল্পকে গল্প করে বলা, সেইসঙ্গে শিল্পের স্বচ্ছতম গুণটিকে ঘাসের শিসে শিশিরবিন্দুর মতো ধরে রাখা — নরেন্দ্রনাথের জাদুশক্তি বলুন, জোর বলুন, সব এইখানে। আর অনায়াস তাঁর এই সিদ্ধি। সেখানে তিনি মপাশাঁ, ও হেনরি, চেকভ কি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আসনে।'' (১৪ই মার্চ ১৯৮৩। (গল্পমালা বইয়ের মলাট)।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলা যায় কল্লোল পরবর্তী যুগের লেখক। বিশ শতকের চারের দশকে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল না সুমধুর। তখন পরিবেশ – পরিস্থিতি ছিল খুবই জটিল। মানুষের জীবন ছিল দিশাহারা। কান্না - হাসির দোল-দোলানো জীবনে সবকিছুতেই এসেছে বাধা। সেই সময় মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের অবস্থা ছিল খুবই ভয়াবহ। প্রতিটি পদক্ষেপে দিশাহারা মানুষগুলি ব্যথা পেয়েছে। একদিকে কালোবাজারি, মজুতদারি, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিমান-হানা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে তখন তারা ছিল বিধ্বস্ত। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — ''বাঙালি নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আশা - আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার সফল রূপকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবনের এত বড়ো শিল্পী খুব কমই এসেছেন। আপাতত-শান্তি বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনে যে এতো রহস্য ছিল তা নরেন্দ্রনাথ উদঘাটন করে না দিলে আমরা জানতেই পারতাম না। মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনে তিনি নির্মম নিপুণ।'' (পৃঃ ৩৮৫)

প্রত্যেক লেখকই কমবেশি নিজের চেনা জানা গণ্ডির ভেতর থেকে গল্পের উপাদান খুঁজে নেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রও সৃজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা কথাসাহিত্য রচনা করেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'মহাশ্বেতা', 'চোর' চাঁদমিঞা', সেতার, হেডমাস্টার, 'পালঙ্ক' গল্পের মতো 'রস' গল্পেও অর্থনৈতিক – সামাজিক দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের পাঠ্য 'রস' গল্পের বিষয় ও কাঠামোগত বিন্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সর্বোপরি বলা যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখনী আর্থসামাজিক সংকটকে নির্ভর করে সাহিত্য সৃজন করেছে। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে শান্ত-নিস্তরঙ্গ পল্লীজীবন যেমন উঠে এসেছে তেমনি কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকে তিনি নিপুন শক্তিতে তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্যকর্মকে নিয়ে চলচ্চিত্র রূপায়িত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – অগ্রগামীর হেডমাস্টার, বিলম্বিতলয়, রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' প্রভৃতি। ১৯৭৪ সালে 'রস' গল্প অবলম্বনে বলিউডে একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। হিন্দি চলচ্চিত্র 'সওদাগর' ছবিতে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেছিলেন

'মোতালেফ' চরিত্রে। ২০১৯ খ্রিঃ অমিতাভ বচ্চন দাদাসাহেব ফালেক পুরস্কার পেয়েছেন। গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই চলচ্চিত্রের আগেই ১৯৬২ খ্রিঃ আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খ্রিঃ।

৩১০.২.৫.২: গল্প পরিচয় - রস

বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ কথাকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের চারের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি গোত্রান্তর ঘটিয়েছেন। সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না-বাংলা গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার ছিলেন বলে, মানব চরিত্রের অন্তর্নিহিত রূপটি 'রস' গল্পের মধ্যে তুলে ধরতে পেরেছেন। ফুলবানু ও মাজুখাতুনকে কেন্দ্র করে মোতালেফের অন্তরে প্রেমের যে দ্বন্দ্ব 'রস' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে প্রেম-প্রীতি এসেছে তাঁর লেখনীর কলা কুশলতায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পটি শুরু করেছেন এইভাবে —''কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজু খাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনা-দানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত- ক্ষামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে ? মাজুখাতুন ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়ো পড়ো শনের কুঁড়ে। এই তো বিষয় সম্পত্তি, তারপর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়ে মানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজু খাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটির নায়ক মোতালেফ। খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা তার কাজ। এই শিক্ষা মোতালেফ নিয়েছে রাজেক মৃধা নামে এক নামডাকওয়ালা গাছির কাছ থেকে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি কার্তিক মাসে গাছে গাছে খেজুর রস সংগ্রহ করে ঘরে আনলেও তার ভাল আয় হয় না। সকাল বেলায় খেজুর গাছ থেকে রস নামিয়ে আনে, তার পর সেই রসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। তারপর সেই খেজুর গুড় দিয়ে যেমন পাটালি তৈরি হয় তেমনি টিনে বা মাটির হাঁড়িতে করে খেজুর গুড় বাজারের দোকানে চলে যায় বিক্রির জন্য। নরেন্দ্রনাথ মিত্র যখন 'রস' গল্পটি লিখেছিলেন তখন খেজুর গুড় বিক্রির ভালো বাজার ছিল না, তাই বিক্রি-বাটাও কম হতো।

তখনকার দিনে সাধারণ মানুষদের পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট লেগেই থাকতো। গ্রামের দিকে ভাল কাজ পাওয়া যেত না। আবার কেউ বড়লোকের বাড়িতে কাজ পেলেও সম্মানজনক পারিশ্রমিক পেত না। তারফলে জীবন নির্ধারণের জন্য বাধ্য হয়ে খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করতে হতো। এখনকার দিনের মতো ১০০ দিনের কাজ, ২ টাকা কিলো দরে রেসন থেকে চাল সংগ্রহ করা ইত্যাদির ব্যবস্থা

ছিল না। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে মোতালেফ প্রচুর পরিশ্রম করে রস সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মোতালেফের মতো অনেকেই রসে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকতো বলে, বাজারে গুড় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতার মধ্যেও পড়তে হতো।

'রস' গল্পের মাজুখাতুন ছিল সব দিক দিয়ে বঞ্চিতা ও অবহেলিতা নারী। মোতালেফ, মাজুখাতুনকে বিয়ে করেছে কার্যসিদ্ধি উদ্ধারের জন্য। শুধু নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রয়োজনে ও খেজুর রসের ভালো গুড় তৈরির জন্য তাকে সে নিকা করে এনেছে। গল্পপাঠে আমরা জানতে পারি মোতালেফ মাজুখাতুনকে কখনোই ভালোবাসেনি। মোতালেফের চাউনিটা তেরছা হলে কি হবে, সে বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়েছে। এমনকী সুন্দর মুখের খোঁজ করেছে সে অনবরত। 'রস' গল্পটির মূল কাহিনী খেজুরগাছ থেকে রস সংগ্রহের কাহিনী হলেও লেখক মানবজীবনের গভীর রোমান্টিক রসকে তুলে ধরেছেন।

খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরির ভালো কারিগর ছিল মাজু খাতুন। সেইজন্য মোতালেফ, মাজুখাতুনকে নিকা করে নিয়ে এসেছিল। এমনকী মোতালেফকে নিকা করার খরচ পর্যন্ত দিতে হয়নি। যাইহোক, মোতালেফ অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভেবে মাজুখাতুনকে বিয়ে করেছে। কেননা মাজু খাতুন, একমাত্র মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পর স্বামীর ভিটেয় একাকী জীবন ভালো লাগছিল না বলে মোতালেফের কথাতে রাজী হয়েছিল। মাজু খাতুন, বয়সের দিক থেকে মোতালেফের থেকে বড়। তবুও, মাজুখাতুনের মোতালেফকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য একটাই, সে সবদিক থেকে সুপুরুষ।

মোতালেফ সফল একনিষ্ঠ কর্মী; যে কাজে হাত দিয়েছে, সে কাজে সোনা ফলেছে। সে সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠে, আর রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে কাজ করেছে। খেজুর গাছ করে, জ্বালানি সংগ্রহ করে, রস সংগ্রহ করা সত্যিই কঠিন কাজ। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, তার মনে সহজ-সরলতা প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। তখন নিজের হাতে তৈরি করা গুড়ের সুনাম কি করে হবে, সেই চিন্তাতে ব্যস্ত থেকেছে। আর মাজুখাতুন, মোতালেফের সঙ্গে থাকলে, তাদের তৈরি করা গুড় বাজারে অনেক মানুষের মুখে স্বাদ এনে দিতে পারে।

আসলে সেইসময়কার মুসলিম সমাজের ভেতরের ছবিকে নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় তালাক দেওয়ার রীতিকে যেমন দেখানো হয়েছে তেমনি নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ যে কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল তাও লেখকের নজর এড়িয়ে যায় নি। আবার কন্যাপণ দেওয়ার রীতিও যে সেই সময়কার সমাজে চলতো তারও পরিচয় আমরা গল্পে পেয়েছি। ফুলবানুর বাবা এলেম সেখ, মোতালেফের সঙ্গে ফুলবানুর নিকা দেওয়ার সময় অর্থ নিয়েছে। ''সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মার ধোর করে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইড়ুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয়ে যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। এক

নজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে।'' আঠের-উনিশ বছরের স্বামী পরিত্যক্তা ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের আকর্ষণ সবাধিক। সেই পরিস্থিতিতে ফুলবানুও মনের মানুষের মান রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। সেইসঙ্গে ফুলবানুও দেখে নিতে চেয়েছে মনের মানুষের 'ত্যাজ' কতখানি।

শীতের শুরুতেই মোতালেফ ৮০ থেকে ১০০টি খেজুর গাছ রস সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে। মাজুখাতুন, মোতালেফের বাড়িতে আসার পর থেকেই খেজুর গাছের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। চৌধুরীদের বাগানেও ত্রিশটি গাছ বেশি বরাদ্দ পেয়েছে। চৌধুরীদের সঙ্গে মোতালেফের চুক্তি হয়েছে ,–''গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি করে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে জুৎসুই করে নিতে হবে ছ্যান। তারপর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপটুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক মেহনৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।''

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যে মোতালেফকে নিজের হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সঙ্গে কাজ করে, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাছাড়াও রাজেকের সঙ্গে সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল কাজ করলেও মোতালেফের মতো তাদের হাত পাকেনি। আসলে খেজুর গাছ কাটলেই হয় না, বা হাঁড়ি বয়ে রস আনলেই হবে না – ''রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই।'' রস থেকে গুড় তৈরির প্রক্রিয়ায় অনেক সময়ের প্রয়োজন। প্রচুর জ্বালানি সংগ্রহ করতে হয়। রস ফুটিয়ে গাঢ় করার জন্য একজন দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। যে মন দিয়ে, ধৈর্য্য ধরে দক্ষ কারিগরের মতো রস থেকে গুড় তৈরি করতে পারবে।

গল্পপাঠে আমরা জানি-মোতালেফের মা, ছোটবেলায় মারা গিয়েছিল। তার ফলে ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে সে বড় হয়েছে। তার উপর তো অর্থনৈতিক হাহাকার ছিলই। মোতালেফ, মাজুখাতুনকে বিয়ে করলে গুড়ের ব্যবসায় বেশ কিছু টাকা অতিরিক্ত উপার্জন হলেও ফুলবানুর রূপের মোহে পড়ে মোতালেফ কিছু দিনের মধ্যেই মাজুখাতুনকে তালাক দিয়ে বসে। মোতালেফ কম বয়সী মেয়েদেরকে তুলনা করতো—'কাঁচা রসের হাঁড়ির' সঙ্গে। আর মাজুখাতুনকে মোতালেফ বলতো – ''তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়।''

তারপর এলেম শেখকে কন্যাপণ দিয়ে মোতালেফ, ফুলবানুকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এরপর ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের সৌন্দর্যময়, স্নিগ্ধসম জীবন শুরু হয়েছে। এমনকী তাদের পারিবারিক জীবন হেসে-খেলেই কেটে গেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে ফুলবানুর যাতে কোন কষ্ট না পায়, তারজন্য মোতালেফ সদা সচেষ্ট থেকেছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ফুলবানুকে, মোতালেফ সুয়োরানী করেই রেখেছে। অপরদিকে মাজুখাতুনের কিন্তু হাতের গুণ ছিল। তার তৈরি করা গুড় বাজারে দুপয়সা সের প্রতি বেশি দরে বিক্রী হয়েছে। মাজুখাতুনের তৈরি করা গুড়ের কদরই আলাদা। কেন না সে তো জাত কারিগর। তাই মেহনৎ করে গুড় তৈরি করতে পারে। সেই মাজুখাতুনকে বিনা অপবাদে মোতালেফ তালাক দিয়েছে। ''গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক

দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। ''মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার ব্যবহার ভারি আপত্তিকর'' এই কথা শোনার পর মাজুখাতুন রেগে গেছে। তারপর মাজুখাতুন তার আগের স্বামীর পুরনো ভিটেতে চলে গেছে।

মোতালেফ সময়ের পরিবর্তনে মাজুখাতুনের সর্বনাশ করে ছেড়েছে। সেই জন্য মাজুখাতুনের বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে মোতালেফকে, মাজুখাতুন জানিয়েছে – ''আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে ? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যাই ফুরাইল অমনি দূর্ দূর্ !'' এই পরিপ্রেক্ষিতে ফুলবানু খুশী হয়েছে ভীষণ। কিন্তু তার সুখ বেশিদিন স্থায়ী ছিল না। তার খুশীর মনোভাব শীত আসতেই বিষন্নতায় ভরে গেছে। একবছর ঘুরে আবার যখন শীতের সময় এসেছে। তখন মোতালেফ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তখন মোতালেফের একটাই উদ্দেশ্য ভাল গুড় তৈরি করে বাজার ধরে রাখা। সে গুড় তৈরিতে কোন ফাঁকি রাখেনি অথচ ভাল গুড় তৈরি হচ্ছে না। মানুষও ফুলবানুর হাতের গুড় খেয়ে আবার আগের মতো স্বাদ পাচ্ছে না। তাই বাজারে মোতালেফের গুড়ের চাহিদা নেই। ফলে তার জীবনে অর্থনৈতিক সংকট নেমে এসেছে।

ওদিকে মাজুখাতুনও ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো – পড়ো শনের কুঁ ড়োয়। কিন্তু মাজুখাতুনের দিন কাটলেও, রাত কাটতে চায় না। সেই দৃশ্য দেখে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদের মাজুখাতুনের প্রতি মায়া হয়েছে। ''নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুঁড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থ ঘরের বউই তার পছন্দ।'' আমরা জানি, নাদির শেখের পঞ্চাশ-একান্ন বছর বয়স হয়ে যাওয়ায় খুব সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ কয়েকটি ছোট ছোট বাচ্চা রেখে তার বউ কলেরায় মারা যাওয়াতে তার এত দুঃশ্চিন্তা। সেইজন্য মাজুখাতুনকে সে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এসেছে। এতে নাদির শেখ খুব খুশী হয়েছে। নাদির শেখ গাছি নয়, শীতকালে খেজুর গাছ কাটতে যায় না। সে বরঞ্চ –''বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে।'' কেননা মাজুখাতুনের রসের ব্যাপারে তার ঘেন্না ধরে গেছে।

মাজুখাতুন, নাদির শেখকে বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ফুলবানুও খুশী হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে মোতালেফ দিনরাত বউকে তোয়াজ করতে শুরু করেছে। বাজার থেকে ভালো ভালো আনাজ কিনে নিয়ে এসেছে। দু'জনে হাসিতে, খুশীতে, আনন্দে থেকেছে। তখন মোতালেফ, ফুলবানুকে বলেছে – পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর – একজনের পানখাওয়া – ঠোঁটের রস লাগে।'' মোতালেফের নিজের কোন ভুঁই ক্ষেত নেই, সেইজন্য মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চাষ করেছে। কিন্তু ভালো কৃষক বলে কোনদিনই সে পরিচিত ছিল না। ''ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ – দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহলে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।''

কিন্তু ফুলবানুর সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বছর ঘুরতেই মোতালেফ খেজুর গাছে রস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গল্পে দেখা গেছে ''বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্ত্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ।'' মোতালেফের খেজুর গাছের সংখ্যা এবছর বৃদ্ধি পেয়েছে। খেজুর গাছে রস আনার ব্যাপারে এ গাঁয়ের মধ্যে মোতালেফই সেরা। কেননা সে তো দক্ষ গাছী। সেইজন্য মোতালেফের হাতে একটুও সময় নেই ফুলবানুর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করার। কিন্তু রস সংগ্রহ করে আনলে কি হবে, রস থেকে গুড় তৈরি করতে গিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফুলবানু গুড় তৈরী করতে পারে না, শেখালেও গুড় তৈরির প্রক্রিয়া মনে রাখতে পারে না। মোতালেফ ডালপাতা, খড় সংগ্রহ করে ফুলবানুকে গুড়ে জ্বাল দিতে বলেছে – ''রস জ্বাল দেও, — যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'' কিন্তু ফুলবানুর এত রস একসঙ্গে জ্বাল দেওয়ার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ফুলবানুকে, মোতালেফ উৎসাহ দিয়েছে; তাকে সব বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। তার একটাই লক্ষ্য –''মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মধ্যেও তেমন করা চাই।''

উনুনের ধারে বসে ফুলবানুর রূপ-সৌন্দর্য আগুনের তাপে ঝলসে যায় গেছে। কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, তবুও মনের মত গুড় তৈরি হয় না। ''কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।'' মোতালেফের তৈরি গুড় বাজারে চাহিদা নেই।স্বাদে, গন্ধে কোনদিক থেকেই বাজার দখল করতে পারে না। তারফলে মোতালেফের গুড়ের যে সুনাম ছিল। তা নষ্ট হয়ে গেছে। পরিচিত ক্রেতা যারা ছিল, তারাও আর তার কাছ থেকে গুড় কেনে না। ''পুরনো খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মিঞা ? গত হাটে নিয়া দেখলাম গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে; আস্বাদ ঠোটে লাইগা রইছে এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিকদারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'' এরপরই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাকাটি শুরু হয়েছে ও সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সুনাম নষ্ট হওয়ায় মোতালেফের সারা অঙ্গ পুড়ে ছার-খার হয়ে গেছে। সে প্রচুর পরিশ্রম করলেও গুড়ে স্বাদ হচ্ছে না, মানুষ গুড় খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে না। এরফলে ক্রেতাদের কাছ থেকে প্রায়দিনই নিন্দামন্দ শুনতে হয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক ভাবে মোতালেফ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফুলবানুর রূপ সৌন্দর্যে একদিন মোহিত হয়েছিল মোতালেফ। আর এখন সেই ফুলবানুই হয়ে উঠেছে তার চক্ষুশূল। এমনকী ফুলবানুকে নানারকম কটু কথা বলতেও মোতালেফ ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত ফুলবানুর চুলের মুটি ধরে অপমান করে, কটূ কথা শুনিয়েছে — ''হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই – তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুণা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এইজন্যেই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জন্যে''! এরপর ফুলবানু অপমান সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এই পরিস্থিতিতে মোতালেফের সঙ্গে তার ঘর করা অসহ্যনীয় হয়ে উঠেছে। বদরাগী মানুষ মোতালেফের সঙ্গে সে সম্পর্ক ছেদ করতে চেয়েছে। কিন্তু এলেম শেখ মেয়েকে বুঝিয়ে রেখে গেছে –''গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদলবদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবার মিলমিশ

হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি দিনে হয়, রাত্রে মেটে।'' তবুও মোতালেফের সঙ্গে ফুলবানুর মধুর পারিবারিক সম্পর্কে চিঁড় ধরেছে। তারফলে ফুলবানুর জীবনে পারিবারিক সংকট নেমে এসেছে।

তবুও মোতালেফ আগের মতই দৈনন্দিন কাজ করে গেছে। ভোরের বেলায় গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নীচে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু গত বছরের মতো তার মনে কোনও সুখ নেই। সেই পরিস্থিতিতে দু'মাস পর মোতালেফেরও পারিবিরিক সংকট নেমে এসেছে। শুকনো মনে, পারিবারিক সংকটের মধ্যে মোতালেফের জীবনে রঙ্গ-তামাশার অভাব দেখা গেছে। ''রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।''

এই অবস্থায় একদিন হাটের মধ্যে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় নাদির শেখের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। তারপর মোতালেফ, নাদির শেখের ছেলেমেয়েদের জন্য সের দুই তিন গুড় দিতে চায় বিনামূল্যে। নাদির শেখ সে গুড় নিয়ে বাড়ি গেলে রেগে জ্বলে ওঠে মাজুখাতুন। গল্পে দেখা যায়, মাজুখাতুন রেগে আগুন হয়ে বলতে থাকে —''ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'' পরের হাটবার থেকে নাদির শেখ আর মোতালেফের গুড়ের কাছে যায় না। কেননা মাজুখাতুন তার সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। অপরদিকে নাদির শেখও, মাজুখাতুনকে ভয় করে। সে জানে, মাজুখাতুন সব দিক দিয়ে পারদর্শী। তাই রাগলে আর কারোর রক্ষে নেই, তখন মাজুখাতুনের কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

বেশকিছুদিন নাদির শেখের সঙ্গে মোতালেফের দেখা হয়নি। তাই দু'হাঁড়ি রস নিয়ে মোতালেফ, নাদির শেখের বাড়ি চলে এসেছে। এই অবস্থায় নাদির শেখ মনে মনে ভয় পেয়ে গেছে। গল্পে দেখা যায়-''যে মানুষের নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।'' ঘরের ভেতর থেকে মাজুখাতুন সব লক্ষ্য করেছে, তাই এখন মোতালেফকে তার সহ্য হচ্ছে না। নাদির শেখ কিন্তু যথারীতি অতিথি আপ্যায়ন করেছে। মাজুখাতুন, মোতালেফকে লক্ষ্য করে বলেছে –''তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়।'' মোতালেফ, নাদির শেখের বাড়ি এমনি এমনি আসেনি, সে এসেছে তার আসল উদ্দেশ্য নিয়ে। মাজু খাতুন যেহেতু ভাল গুড় তৈরি করতে পারে, তাই তার কাছে বিনীত অনুরোধ-যদি মাজু খাতুন একটু ভাল গুড় বানিয়ে দেয় তাহলে তার নতুন খদ্দের হয়। এমনকী গুড় বিক্রি করে আবার আগের মতন বাজার ধরতে পারে। তাহলে মোতালেফের অর্থনৈতিক উপার্জন ও বৃদ্ধি পায়। এই কথায় মাজু খাতুনের চোখে অভিমানের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। যা শুধুমাত্র মোতালেফের মতো ব্যবসায়ী মানুষই বুঝতে পেরেছে। সেই পরিস্থিতিতে নাদির শেখ বলেছে- ''ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুননি নিবা গেল কইকার ?'' গল্পের শেষে মোতালেফ তখন শেষ প্রতীকী বাক্য বলতে থাকে –''মেঞাভাই, নেবে নাই।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'রস' গল্পের কাহিনী শেষ করেছেন এইভাবে। আসলে প্রকৃতির নিয়ম বড় বিচিত্র। জৈবিক প্রবৃত্তির তাড়নায় মোতালেফের জন্য মাজুরও মন ছটফট করেছে। তাই মাজুখাতুন যতই রাগ করুক, ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মোতালেফকে অপমান করুক। তারপরেও মোতালেফের প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়েছ। পুনরায় সম্পর্কের জোট বাঁধার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গেছে। সেই জীবনধর্মিতাকে কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র 'রস' গল্পটিতে নিপুণ তুলিতে অঙ্কণ করেছেন।

৩১০.২.৫.৩: 'রস' গল্পের চরিত্রসৃষ্টি

'রস' গল্পের মাজুখাতুন চালাক চতুর হলেও অবহেলিতা নারী। মোতালেফ শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখেছে, তাই মাজুখাতুনকে ভালোবাসেনি। শুধু নিজের প্রয়োজনে, খেজুর গাছের রস থেকে গুড় তৈরির সময় তার দরকার পড়েছে। আর গুড় তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে তার উপর নেমে এসেছে অত্যাচার। গল্পপাঠে আমরা জানতে পেরেছি - মোতালেফ ভালোবেসেছে ফুলবানুকে। তাকে নিয়ে সে সুখে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু ভালো গুড় তৈরি করতে পারে না বলে, মোতালেফ ফুলবানুকেও মানসিক দিক থেকে অত্যাচার করতে শুরু করেছে। অপরদিকে মাজু খাতুনের মনেও ক্রোধ হিংসা জেগে উঠেছে। সে প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে মোতালেফকে উদ্দেশ্য করে বলেছে – ''তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর, বিড়াল, থিকাও অধম থাকে মানুষ শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়।''

বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের চারের দশকে নারী চরিত্রগুলি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেননা নারীদের মধ্যে ভালো মন্দ বোঝার সময় এসে গেছে। আর পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন নেই, তা তারা বুঝতে শিখেছে। চারের দশকে দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নারীশক্তির আত্মিক অবক্ষয় ঘটেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক সব দিক থেকে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বীরাঙ্গনা হিসেবে প্রতিবাদী হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। চরিত্রটি যেন মধ্যবিত্ত ধ্যান ধারণা থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে সমকালের উপযোগী আধুনিক নারী চরিত্র হয়ে উঠেছে। মাজুখাতুন আর মুসলিম সমাজের নিয়ম কানুনের মধ্যে বন্দী নয়। একবিংশ শতাব্দীতে তিন তালাকের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বিল পাশ করেছে। তারফলে নারীরা নিজেদের মনের কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পেরেছে। অন্ধ-কুসংস্কার থেকে আজকের দিনের নারীরাও মুক্ত হতে পেরেছে।ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সময় এসেছে। কিন্তু 'রস' গল্পের মাজুখাতুনকে দেখে আমরা বুঝতে পারি ঐ সময়ে মুসলিম সমাজ তিন তালাকের মতো কোন আইন ছিল না। তবু সে নিজের ভালো-মন্দ বুঝতে পেরেছে। নিজের জীবনে শান্তিতে থাকার জন্য মোতালেফের মতো স্বার্থপর মানুষকে ঘৃণা করেছে। মাজুখাতুনের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক তৎকালীন সমাজের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অবস্থানের চিত্রটিও লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নারীরা যে অবহেলিত নয়, তাদেরও মান-মর্যাদা আছে। মাজুখাতুনকে দেখলেই তা বোঝা যায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই প্রেক্ষাপটেই 'রস' গল্পের নারী মননের সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনাগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

৩১০.২.৫.৪: নামকরণ

বাংলা মধ্যবিত্ত জীবনের একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। বিশ শতকের চারের দশকে বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি বিবর্তন ঘটিয়েছেন। তখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার চিত্র গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তিনি মানবচরিত্রের ভেতরের রূপটি টেনে এনে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। 'রস' গল্পের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার সম্পর্ককে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করেছেন। মাঘ মাসে মোতালেফ খেজুর গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামিয়ে এনেছে। মাটির উনুনে রস জ্বাল দিতে পারতো মাজুখাতুন। তার হাতের গুড়ের স্বাদই আলাদা। মোতালেফ তাকে

তালাক দেওয়ায় সে চলে গেছে নাদের শেখের বিবি হয়ে। মোতালেফের ঘরে এসেছে সুন্দরী বউ ফুলবানু, কিন্তু তার হাতে গুড় ভাল হয় না। মোতালেফ এক রসের লোভে আর এক রসের হাঁড়ি ভেঙে ফেলেছে। মোতালেফ যেহেতু শিল্পী কারিগর, লোকে তার বদনাম করেছে। তখন সে ছুটে চলেছে, মাজুখাতুনের কাছে রসের হাঁড়ি নিয়ে। তাই সব দিক থেকে 'রস' নামকরণ সার্থক।

গল্পমালা -১ এর ভূমিকায় 'রস' গল্প সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন — ''এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূর্বদিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুরগাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সে সব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখত। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝির ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে করে, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে করে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি করতেন আমাদের মা — জেঠীমারা। শীতের দিনে রস থেকে গুড় তৈরির এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমাদের চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে 'রস' গল্পটি বেরিয়ে এসেছে।'' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের যে কাহিনী মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। গল্পটিতে তিনটি চরিত্রের হৃদয়ের আকর্ষণ যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি কাজ ফুরিয়ে গেলেও চরিত্রগুলিকে অপমান করতেও দেখা গেছে। খেজুর রসকে ঘিরে রূপ-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে জীবিকার সংঘাত নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিপুণ তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গল্পের নায়ক চরিত্র মোতালেফ, ও দুটি নারী চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি; তারা হল মাজুখাতুন ও ফুলবানু। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে জীবন ও যৌবনের চাহিদা মেটানোর জন্য সুচতুর মোতালেফ 'রসের হাঁড়ি'-কে ব্যবহার করেছে। সেইজন্য সে ফন্দি ফিকিরও করেছে। সর্বোপরি 'রস' নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

৩১০.২.৫.৫: গল্পভাষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পভাষা খুবই সহজ-সরল এবং সুখপাঠ্য। তাঁর লেখা গল্প পড়ে পাঠকের কোন ক্লান্তি আসে না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাষার সাবলীলতা -প্রাঞ্জলতা তাঁর গল্পের প্রাণ। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সহজ-সরল-সুন্দর ভাষায় গদ্য রচনা করেছেন। জীবনের শেষ অবধি আনন্দবাজার পত্রিকার সহসম্পাদক পদে কর্মরত থেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলা গদ্যের অন্যতম সেরা কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র সে সময়ের মানুষের আঁতের কথাকে নিজের মতো করে গল্পে উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। এখন আমরা 'রস' গল্পের কয়েকটি সংলাপ তুলে ধরব- যেগুলি মোতালেফ, মাজুখাতুনের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছে-

ক) কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাঁচা রসের হাঁড়ি।

খ) তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা ?

আবার 'রস' গল্পে ফুলবানুর প্রতি মোতালেফের সংলাপ লক্ষণীয়।

ক) গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া পড়ে।

খ) পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঁঙ্গা হয় না, আর একজনের পানখাওয়া – ঠোঁটের রস লাগে।

'রস' গল্পের শেষের দিকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনারীতি ও ভাষা বৈশিষ্ট্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ-

''হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুনই নিবাই গেল কইকার ? হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, না মেঞাভাই নেবে নাই।''

৩১০.২.৫.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করো।

২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের ব্যঞ্জনা নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দাও।

৩। 'রস' গল্পটির শিল্প সার্থকতা সম্পর্কে তোমার অভিমত লিপিবদ্ধ করো।

৪। 'রস' গল্পে মোতালেফ চরিত্র সম্পর্কে যা জান লেখো।

৫। 'রস' গল্পে নারী চরিত্র হিসেবে মাজুখাতুনের পরিচয় দাও।

৬। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পের অর্থনৈতিক সংকটের পরিচয় নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৩১০.২.৫.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। গল্পমালা - নরেন্দ্রনাথ মিত্র - আনন্দ পাবলির্শাস।

২। বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত - পুস্তক বিপণী।

৩। বাংলা ছোট গল্প : মননে-দর্পণে - শীতল চৌধুরী।

৪। আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী - জগদীশ ভট্টাচার্য।

৫। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি - সোহারাব হোসেন।

৬। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প - সরোজমোহন মিত্র।

একক - ৬

সুন্দরম্

সুবোধ ঘোষ

বিন্যাসক্রম

৩১০.২.৬.১ : লেখক পরিচিতি—সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)

৩১০.২.৬.২ : সুন্দরম্

৩১০.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.২.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.২.৬.১ : লেখক পরিচিতি—সুবোধ ঘোষ (১৯০৮-১৯৮০)

জন্ম ১৯০৮ সালে হাজারিবাগে। নিজের জীবনে অল্পবয়স থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগ্রাম ও জীবিকার দ্বারা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। যার ফলে জীবন-পর্যবেক্ষণের বিস্তৃত সুযোগ ঘটেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর পঠন-পাঠন সমৃদ্ধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস লিখেলেও সুবোধ ঘোষ ছোটোগল্পকার হিসেবে সমধিক সার্থক শিল্পস্রষ্টা। তাঁর সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ 'অগ্রণী পত্রিকায় 'ফসিল' নামে গল্প লিখে। এই গল্প পাঠকমহলে ইতিবাচক সাড়া জাগায়। প্রথম গল্পেই বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং রচনাশৈলীর বিশিষ্টতার যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন সুবোধ ঘোষ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনায় সেই প্রতিশ্রুতির ব্যতয় ঘটেনি। চতুর্ভুজ ক্লাব, সুন্দরম্, কর্ণফুলির ডাক, পরশুরামের কুঠার, অযান্ত্রিক, পরিণাম রমণীয় তাঁর বিখ্যাত গল্পের কয়েকটি। সুবোধ ঘোষের গল্প উপন্যাসে বহির্বঙ্গের প্রেক্ষাপট বাংলা কথাসাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তৃতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মননশীলতা ও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের গুণে সুবোধ ঘোষের সমাজবীক্ষা এবং চরিত্রায়ণ তাঁর সৃষ্টিকে উন্নত মানের অধিকারী করেছে। নৃতত্ত্ব, পুরাণকথা, সামরিক বিদ্যা, ইতিহাস, শিল্পচিন্তা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে কৌতুহলী এই লেখক সম্পাদনা কর্মেও দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন। আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত এই লেখক বাঙালীর হৃদয়ে অক্ষয় আসনে অধিষ্ঠিত।

৩১০.২.৬.২ : সুন্দরম্ (সুবোধ ঘোষ)

"সমস্যাটা হল সুকুমারের বিয়ে।"

'সুন্দরম্'-গল্পের শুরুতে একটি ছোটো বাক্য। কিন্তু বাক্যের প্রথম শব্দ 'সমস্যাটা' গল্পের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছে। সমস্যা যাকে নিয়ে, সে "সুকুমার" এবং সমস্যার বিষয় "বিয়ে"। সাধারণভাবে আমাদের বিবাহ

সমস্যার নানা কারণ মনে আসে। সুকুমারের বিয়েটা তার পরিবারের কাছে এই কারণে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সুকুমার আবাল্য ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছে নিষ্ঠার সঙ্গে, এখন বিয়ের বয়স হয়েছে তার। তা সত্ত্বেও তাকে বিয়েতে রাজি করানো যাচ্ছে না। সংসার সম্পর্কে তার ঔদাসীন্য দেখে তার প্রিয়জনেরা আতঙ্কিত। ছেলে সংসারবিমুখ বিবাগী হয়ে গেলে বংশ রক্ষা হবে কীভাবে? এই চিন্তা থেকে সুকুমারকে সংসারজীবনে উৎসাহী করবার উপায় খোঁজেন তাঁরা। এই কাজে সবচেয়ে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারবে বলে নিযুক্ত হয় সুকুমারের একজন ভগ্নিপতি কানাইবাবু। একটু একটু করে উপদেশ-পরামর্শ-মন্ত্রণা দিয়ে কানাই ক্রমে সুকুমারকে উপন্যাস পড়ায়, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। সুকুমারের নির্লেপে ফলত কোথায় যেন ফাটল ধরে। একদিন সে কানাইকে উদ্বেলিত স্বরে বলে ওঠে—'মানুষের মাঝে আমি বঁচিবারে চাই'।

এই গল্পে সুকুমারের বাবা লাসকাটাঘরের 'ঝানু সার্জেন' কৈলাস ডাক্তার জীবনতত্ত্বের অন্য একটি দিক ধরে রয়েছেন। সুকুমারের ঔদাসীন্যে বাড়ির অন্যান্যদের মত তিনি বিচলিত নন। হয়তো ডাক্তারী বিজ্ঞানচেতনা থেকেই তাচ্ছিল্যভরে তিনি বলেন—'প্রোটিনের অভাব.... কত পাকামি দেখলাম!' সত্যি সত্যিই সুকুমারের ব্রহ্মচর্য-সাধনাপর্ব কেটে যায় একদিন। জীবনের স্বাভাবিক প্রেরণা ও দাবিকে দুরে সরিয়ে রেখে সুকুমার যে কৃত্রিম ভাবজগতে এতদিন বিচরণ করেছে, সেখান থেকে সে যখন ফিরল, তখন তার ভিতরের বুভুক্ষা কোন্ কাঙ্ক্ষনীয় সুন্দরকে বরণ করে নিল, তারই গল্প 'সুন্দরম্'।

সুকুমারের জন্য পাত্রী দেখা শুরু হল। প্রথম পাত্রীকে অপছন্দ করায় নাকচ করার পর গল্পে দ্বিতীয় আর একটি দিকের অবতারণা। আচমকা, পাঠককে কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে কৈলাস ডাক্তারের বাড়িতে কদাকার আবর্জনার মত একটি পরিবার ঢুকে পড়ে। 'মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী'। ডাক্তারের ময়নাঘরের সহকরী যদুডোম ও নিতাই সহিসের উদ্যত গলাধাক্কা থেকে ডাক্তারই বাঁচান পরিবারটিকে। কুষ্ঠরোগী হাবু বোষ্টম, তার সঙ্গিনী বসন্তরোগে কানা হয়ে ইরানী বেদিয়াদের দলছাড়া হামিদা, তাদের শিশুপুত্র আর তাদের মেয়ে তুলসীকে নিয়ে এই পরিবার। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত তুলসীর বর্ণনা 'সুন্দরম্' গল্পের সৌন্দর্য সম্পর্কিত তত্ত্বটির উপস্থাপনায় বিশেষ জরুরী—"দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। কোনো ডাকিনীর টেরাকোটা মূর্তির মত কালি-মারা শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ, টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে জন্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়। গা শির শির করে।"

হাবু বোষ্টম কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হওয়ায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিতে এসেছে। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবার জন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির অনুমতি পেতে গেলে এই সার্টিফিকেট জরুরী। কৈলাস ডাক্তার রাজি হলেন এবং এই কুৎসিত পরিবারটি অপসৃত হবার পর তাঁর পরিবারের সুন্দরী পুত্রবধূসন্ধানী সদস্যদের উদ্দেশ্য করে হেসে হেসে বললেন—'দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে! ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?' কদর্য চেহারা নিয়েও ডাক্তারের দৃষ্টিতে তুলসী সুন্দরী, কেননা সেই বিশিষ্ট প্রেক্ষণবিন্দু স্বাস্থ্যশ্রী, দেহযন্ত্রের সুচারু সুষমাই সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কৈলাস ডাক্তারের সুন্দরের ধারণা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর কর্মজগতের অভিজ্ঞতা থেকে। আপাতসুন্দর দেহ মৃত্যুর পর যখন লাশকাটা টেবিলে শোয়ানো থাকে, অভিজ্ঞ সার্জেন তার আপাদমস্তক কাটাছেঁড়া করে বিশ্লেষণ করেন, তখন তার অন্তরঙ্গ রূপ চোখে পড়ে তাঁর। সেই বিশিষ্ট রূপের জহুরীর কাছে দেহযন্ত্রের আভ্যন্তর রূপই আসল সত্য। বাইরের রূপ নয়, স্বাস্থ্যের

সৌন্দর্যকে ডাক্তার সুন্দর বলে মানেন বলেই তিনি কদাকার তুলসীকে 'সুন্দরী তুলসী' বলে অভিহিত করেন। এই সঙ্গে গল্পের irony বা পরিহাসের মতো শোনা যায় ঝি-এর একটি মন্তব্য—'বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর বিয়ে নয়!'

এইখানেই গল্পের টার্নিং পয়েন্ট। সুকুমারের বিবাহের প্রতি অনাসক্তি থেকে আকর্ষণ জেগে ওঠা এবং পাত্রী পছন্দ করাতে তার যথেষ্ট শুচিবায়ুর পরিচয় রয়েছে। সদ্বংশজাত, ধনী পরিবারের, শিক্ষিতা, সুরুচি-সম্পন্না সর্বোপরি সুরূপসী কন্যা ছাড়া সুকুমার বিয়েতে রাজি হয় না। একের পর এক পাত্রী দেখা চলতে থাকে। সুকুমার নাকচ করতে দ্বিধাবোধ করে না সেইসব পাত্রীদের। ইতিমধ্যে অন্য ঘটনা ঘটে। ডাক্তার একদিন তুলসীকে দেখতে পান সুকুমারের পড়ার ঘরের বারান্দায়। যদু তাড়িয়ে দেয় তাকে। আর একদিন তুলসীর সঙ্গে যদু-নিতাইকে একই জায়গায় বসে মস্করা করতে দেখলেন ডাক্তার। সুকুমারের দরজা খোলা দেখে তাকে সাবধান হতে বললেন। তুলসী থালা হাতে দৌড়ে পালাল। যদু-নিতাই কোনো সদুত্তর দিতে পারল না।

ডাক্তার অসামান্য স্বাস্থ্যবতী, পরিশ্রমী, স্পোর্টসে প্রাইজ পাওয়া মমতাকে পুত্রবধূ হিসেবে নির্বাচন করলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই মেয়েটির গ্রহণযোগ্যতাকে সুকুমার সমেত বাড়ির কেউই মেনে নিল না। বাড়ীর লোকেদের প্রতি বিরক্ত হয়ে ডাক্তার পাত্রী খোঁজার দায়িত্ব তাদের হাতেই ছেড়ে দিলেন।

পরের দৃশ্যে আবার এসেছে তুলসী। এবার তার ভূমিকা অন্যরকম। রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে সে নিতাইদের সঙ্গে বচসা করছে। ডাক্তার শুনলেন পয়সা না পেয়ে সে সুকুমারের ঘরের দিকে ঢিল ছুঁড়েছে, নিতাইয়ের হাত কামড়ে দিয়েছে। তাকে তাড়িয়ে দেবার পরও ফটকের বাইরে থেকে কিছুক্ষণ ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে সে বিদায় হল। তিন-চার মাস ধরে তুলসীর এবাড়ীতে আনাগোনা লক্ষ করেছেন ডাক্তার। তার প্রবেশে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা দিলেন তিনি। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে আবার দেখা গেল তুলসীকে। এবার তুলসী রুদ্রমূর্তিতে নয়, চোরের মত পা-টিপে পালিয়ে গেল। ডাক্তার হাঁকডাক, বকাঝকা করে সুকুমারের ঘরে-বারান্দায় ঢুকলেন, আলো জ্বলছে সেখানে আর তাঁর নিজের ঘর তছনছ করে গেছে কে! আর কিছু নয়, পাওয়া যাচ্ছে না শুধু নতুন বেলেডোনার শিশিটা!

অবশেষে সুকুমারের প্রার্থিত পাত্রী পাওয়া গেল। সৌন্দর্যে তো বটেই, বংশে, শিক্ষায়, গুণে কোনো ত্রুটি নেই সেই মেয়ের। ডাক্তারকে শুধু আশীর্বাদ করতে যেতে হবে সেদিন। সেদিনই ডাক্তারের কাছে ময়না তদন্তের জন্য তিনটি লাস এসেছে। এই কাজ সেরে রেখে তিনি যাবেন ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করতে।

লাসকাটা ঘরে রচিত হয় গল্পের শেষ দৃশ্য। প্রথম দুটি লাস আগুনে পোড়া, 'পচে পাঁক হয়ে গেছে'। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ডাক্তারি রিপোর্ট অকিঞ্চিতকর। তৃতীয় মৃতদেহের টেবিলের পাশে এসে তার ঢাকা খুলে নিতেই চমকে উঠলেন ডাক্তার। আর কারও নয়, ডাক্তারের কাছে যে মেয়েটি তার কুৎসিত দেহাবয়ব নিয়েও 'সুন্দরী তুলসী' — এই মন্তব্য ও বিশেষণ লাভ করেছিল, সেই অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তুলসীর এমন অকালমৃত্যুতে ডাক্তার বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁর বেদনা তাঁকে এই মৃত্যুরহস্য উদ্ধারে আরও তৎপর করে তোলে। অধীত শাস্ত্রজ্ঞান অনুযায়ী তিনি মৃতার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে ধরে ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে চলেন; মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে মাথার খুলি, বক্ষপঞ্জরের অলিগলি ধরে চলতে থাকে তাঁর নিপুণ হাতের

ছুরি, সাঁড়াশি, চিমটে। চোখের পাতার আড়ালে অক্ষিগোলকের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে অনেক অশ্রু নিষিক্ত হয়েছে তুলসীর দুচোখ থেকে—'ইস মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব'। যদু বিশেষজ্ঞের মতো মৃত্যুর কারণ বাতলে দেয়—হাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো, সুইসাইড কিনা! করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।' কিন্তু বিচক্ষণ ডাক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গূঢ় কোনও চিহ্ন তল্লাশ করতে থাকেন। গলার স্বররজ্জু অনাহত, কণ্ঠরোধে মৃত্যু হয়নি। যদুই পথনির্দেশ করে এবার—'এ সবে কোনো জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।' পাকস্থলী দুভাগ করেই ডাক্তার দেখতে পেলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। বেলেডোনা (এ ক্ষেত্রে বিষ) মেশানো সন্দেশ ও পাঁউরুটির অজীর্ণ পিণ্ড থেকে মৃত্যুর কারণ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এতো প্রত্যক্ষ কারণ। আর কোন্ ইতিহাস লুকানো আছে অফুরাণ প্রাণশক্তির অধিকারী মেয়েটির অকালে ঝরে পড়ার পেছনে? বিশেষত ডাক্তারের ঘর থেকেই খোয়া যাওয়া বেলেডোনাই যে মৃত্যু ঘটিয়েছে—তার সঙ্গে কোন্ সংশ্লেষে জড়িয়ে থাকতে পারে তুলসী? এ আত্মহত্যা নয়, হত্যা—কিন্তু কেন? 'উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল দপদপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়ল মেঝের ওপর।' আবার টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন ডাক্তার। তলপেটের বন্ধনী উন্মুক্ত করেই দেখা গেল—'পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এশিয়া।' এই অনভিপ্রেত সন্তানের জন্ম সম্ভাবনা যার সামাজিক স্থিতি টলিয়ে দেবে, তারই প্ররোচনায় তুলসী বেলেডোনা মিশ্রিত খাবার খেয়েছে। জঠরের শিশুসন্তানসহ তলিয়ে গেছে মৃত্যুর অতলে। তুলসীকে সুকুমারের উদগ্র কামনার শিকার হিসেবে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যারা নিয়েছিল, তাদেরই সংক্ষিপ্ত সংলাপে গল্প শেষ করেন লেখক—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'।

'সুন্দরম্' গল্পের শ্রেণী নির্ণয় করতে গেলে লেখকের নিজের একটি মন্তব্য স্মরণে রাখা জরুরী। "এই সৌন্দর্যের একটি লৌকিক সংস্কার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ একটি তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা এই গল্পে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে শারীর সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ।" সুকুমারের পাত্রী নির্বাচনে যত বাছবিচার এবং উন্নাসিকতা, তাতে মনে হয় সে রূপতত্ত্বের প্রচলিত ধারণা ও সংস্কারে আত্যন্তিক বিশ্বাসী। সে মানব মনের একটি দিক। কিন্তু এরই অন্তরালে বাহ্যসংস্কারকে ডুবিয়ে দিয়ে সুকুমারের জৈব কামনার আগ্রাসী প্রেরণা প্রয়োজনের তাগিদে যে মেয়েটির দেহ ভোগ করেছে—তার জাতি-বংশ-মান-মর্যাদা তো দূরের কথা, তার চেহারা দেখলে 'দাতা কর্ণও দান ভুলে যায়'। এই যে ভাবনা এবং আচরণের বৈপরীত্য, এর মধ্যে থেকে একটি তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন লেখক। তাই গল্পটিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসামূলক বলা যেতে পারে। তবে লেখকের মনোলোকে যে কঠিন জিজ্ঞাসা জেগেছিল, তাকে একটি বাস্তবসম্মত প্লটে শিল্পসম্মতভাবে রূপদান করেছেন বলেই একটি তত্ত্ব বহন করা সত্ত্বেও 'সুন্দরম্' শিল্পগুণান্বিত হয়েছে।

'সুন্দরম্' গল্পের climax বা চরম মুহূর্ত এসেছে একেবারে গল্পের শেষে। সুকুমার যদি তত্ত্বনিরীক্ষার বা বিশ্লেষণের মাধ্যম (গিনিপিগ!) হয়, নিরীক্ষক হলেন কৈলাস ডাক্তার। কৈলাস ডাক্তার দেহযন্ত্রের জহুরী। তাঁর চোখ মানুষের বাহ্যরূপের অন্তরালে, আপাতসৌন্দর্যের ভেতরে সত্য ও খাঁটি জৈব রূপকে চেনে। সেই চেনা থেকেই তিনি তুলসীর আপাত কুশ্রী রূপের প্রতি অবজ্ঞা না দেখিয়ে তার স্বাস্থ্যোদ্দীপ্ত রূপের প্রশংসা করেছিলেন। সুকুমারের ব্রহ্মচর্য নিয়ে বাড়ীর সকলে চিন্তিত হলেও তিনি ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছিলেন — 'প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভালো জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক — এসব ব্যামো দুদিনেই কেটে

যাবে।' তাঁর বিশ্লেষণ যে ভুল নয়, তার প্রমাণ — সুকুমার অচিরকালের মধ্যেই রীতিমতো সমঝদারের ভঙ্গিতে পাত্রী (যাচাই) পরিক্রমা করতে লাগল। এই ব্যাপারে কোনোরকম সমঝোতা করতে সে নারাজ। পাত্রী নির্বাচনে যে কয়েকমাস সময় লেগেছে, ততদিনও সুকুমারের ব্রহ্মচর্য অপেক্ষা করে ধৈর্য রাখতে পারেনি। হতকুৎসিত তুলসীকে ব্যাভিচারের খেলায় সামিল করেছে। পরিণামে তুলসী যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। লাসকাটা টেবিলে নিজের বিশ্বাসকে সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেছেন কৈলাস ডাক্তার। তুলসীকে ব্যবহার করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল কে? যেহেতু যদু ও নিতাইয়ের সঙ্গে তাকে বারবার মস্করা বা বাদানুবাদ করতে দেখা গেছে, তাই পাঠকের সন্দেহ প্রাথমিকভাবে তাদের ওপরেও গিয়ে পড়তে পারে। সেই সংশয় নিরসন করে পাঠককে আমূল বিমূঢ় করে দেয় যদু ডোমের উক্তি—'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'। ছোট্ট এই কথায় নিহিত থাকে গল্পের মূল ভাববীজ। গল্প থেকে যায়। কিন্তু এই তথ্যসূত্র ধরেই পাঠকের চিত্তে চলতে থাকে অনুরণন। মানবচরিত্রের অনন্ত রহস্যসূত্র, তত্ত্বগতভাবে জীবনধর্মের বিচিত্র পথচারনা।

'সুন্দরম্' গল্পের বিশিষ্ট জীবনদর্শনটি কৈলাস ডাক্তারের জীবনদৃষ্টির মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। শুধু শবব্যবচ্ছেদ নয়, লেখকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লাসকাটা ঘরের নিরীক্ষার প্রতীকে যেন সমাজব্যবচ্ছেদের কাজই করেছে। সামাজিক বিবাহ সম্পর্ক বা বিবাহবন্ধনের ক্ষেত্রে মানুষ যেসব রীতি-নীতি-সংস্কার মেনে চলে, কার্যত তার অধিকাংশই জৈবিক সংস্কারের আনুগত্য করে না। সুকুমারের কৌমার্য ব্যাভিচারের পঙ্কে স্নান করে তুলসীকে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুরতম পাপকর্ম ঘটে যায়। আর তার বিপরীতে এক সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যাকে বধূরূপে বরণ করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। সমাজের সাজানো সৌন্দর্যবিলাসী সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিমূল কতোখানি দ্বিচারিতা ও মিথ্যার ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রকট হয়ে ওঠে।

'সুন্দরম্' গল্পের নামকরণে লেখক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বিশেষ করে শারীর সৌন্দর্যের সংস্কার সম্বন্ধে একটি কঠিন জিজ্ঞাসার নির্মাণ'—লেখকের বয়ানে গল্পের এই প্রতিপাদ্য। ময়নাঘরের ডাক্তার কৈলাসের সৌন্দর্যদৃষ্টির সঙ্গে প্রথাগত সৌন্দর্যদৃষ্টির মিল নেই। বহুকালের অভ্যাসে তিনি সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন দেহের গভীরে—নাড়ী, ধমনী, পেশি, রক্তমাংসে বিন্যস্ত এক অভিনব অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হন। জামাতা কানাইকে তিনি সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য ধারণার হেঁয়ালির কথা এইভাবে ধরিয়ে দেন— 'তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ড নেই। .....চুল কালো হলে সুন্দর, আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে শাশ্বত কালি দিয়ে? .....' বস্তুত, মানবিক সৌন্দর্যচেতনার স্রষ্টা সুবোধ ঘোষকে এক তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। কৈলাস ডাক্তার তারই প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই সৌন্দর্যের সামনে নেই কোনো জাতি-ধর্ম, শিক্ষা-সভ্যতা, আছে শুধু জীবন। বহমান জীবনধারার অনিবার্য গতি এই সৌন্দর্যদৃষ্টির কাছে সব ভ্রূণই সুন্দর। সব ভ্রূণ সম্ভাবনাই সৃষ্টির পটভূমিকায় স্রষ্টার মত সৌন্দর্যশালী। অপূর্ব এই সৌন্দর্যচেতনাই কৈলাস ডাক্তারের নতুন সৌন্দর্যদর্শন। 'সুন্দরম্' গল্পে লেখকের ময়নাতদন্তের শেষে এই সুন্দরেরই প্রতিষ্ঠা। তাই গল্পটির নামকরণ যথার্থ ও সুপ্রযুক্ত।

'সুন্দরম্' গল্পের ভাষা সম্পর্কে অধিকন্তু বলার অপেক্ষা রাখে। ছোটোগল্পের ভাষায় যে ব্যঞ্জনা প্রত্যাশিত, বিবৃতির পরিবর্তে সঙ্কেতধর্ম নিয়ে তেমন ভাষাই, শব্দচয়নে ও বাক্যযোজনায় লেখক ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও এই গল্পের বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ এক ধরনের ভাষা তাঁর প্রয়োজন ছিল। সে হচ্ছে ময়নাঘরে লাসকাটার বিভিন্ন স্তরপর্যায়কে ফুটিয়ে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা এবং পরিভাষা।

ব্যবচ্ছিন্ন দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভাষা ও পরিভাষা খুঁজতে গিয়ে লেখক অ্যানাটমির পাঠ্যপুস্তকের আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য এই অভিনব রূপের আশ্রয়ে যেমন হয়েছে প্রসারিত, তেমনি বাংলা শব্দভাণ্ডারকে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধশালী করায় সুবোধ ঘোষের বর্তমান গল্পটির অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃতিযোগ্য ঃ "খণ্ড স্ফটিকের মত পীতাভ ছোটো বড়ো কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিস্ফীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠল। ..... ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিকণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে খুলে ধরলেন—পরিশস্কে ঢাকা সুকোমল এক পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এশিয়া।"

৩১০.২.৬.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ''সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'—গল্পটি নানা দিক থেকে অভিনবত্বের দাবি রাখে।"—এই অভিমতটির গুরুত্ব বিচার করো।

২। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'—গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য কোথায় তা গল্প ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুঝিয়ে দাও।

৩। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'-এ আমাদের নান্দনিক চেতনা কীভাবে তির্যক দৃষ্টিতে প্রদর্শিত আলোচনা করো।

৩১০.২.৬.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রীভূদেব চৌধুরী

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — বীরেন্দ্র দত্ত

৩। সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প বিচিত্রা — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৪। বাংলা ছোটগল্প — শিশিরকুমার দাশ

একক - ৭

নিম অন্নপূর্ণা

কমলকুমার মজুমদার

বিন্যাসক্রম

৩১০.২.৭.১ : লেখক পরিচিতি—কমলকুমার মজুমদার

৩১০.২.৭.২ : গল্প পরিচয়—নিম অন্নপূর্ণা

৩১০.২.৭.৩ : নামকরণ

৩১০.২.৭.৪ : চরিত্র চিত্রণ

৩১০.২.৭.৫ : গদ্যভাষা

৩১০.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.২.৭.৭ : সহায়ক প্রশ্নাবলী

৩১০.২.৭.১ : লেখক পরিচিতি—কমলকুমার মজুমদার

বাংলা কথাসাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার ছিলেন কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। তিনি ১৯১৪ খ্রিঃ ১৭ই নভেম্বর উত্তর 'চব্বিশ পরগণা জেলার টাকি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল রেণুকাময়ী দেবী ও পিতা ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার। কমলকুমার মজুমদারের মামার বাড়ি ছিল লখনউ। তাদের সাত ভাইবোনের সংসারে তিনিই ছিলেন সকলের বড়। লেখকের বাবা মা দু'জনেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা নিয়ে তাঁদের বাড়িতে প্রায়শই সাহিত্যচর্চা হতো। পরিবারের সবাই মিলে বিভিন্ন মনীষীদের জন্মদিন পালন করতেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই সংস্কৃতি মনস্ক ছিলেন বলে যাত্রা ও নাটক দেখতে যেতেন। পরবর্তীকালে কমলকুমার মজুমদারের পরিবার বৈদ্যনাথ ধাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে রিখিয়ায় এসে বসবাস করতে লাগলেন। সেখানে তাঁর বাবা জমি কিনে বাড়ি-ঘর তৈরি করেছিলেন। সেখানে দীর্ঘদিন থাকার সূত্রেই লেখককে রিখিয়ার পরিবেশ – পরিস্থিতি বারবার আকর্ষণ করতো। কমলকুমার মজুমদার মায়ের সান্নিধ্যে থেকে ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত চর্চা করতেন ও বিভিন্ন ভাল নাটকের অভিনয় করতেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও

অংশগ্রহণ করতেন। সেইসময় ১৯৩৪ খ্রিঃ জানুয়ারি বিহারের মুঙ্গেরে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। লেখক ও তাঁর বন্ধুরা ভূমিকম্প বিধ্বস্ত এলাকায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কমলকুমার মজুমদারকে রাজশাহীর খেতুরির মেলাতে বিভিন্ন সাধু-সন্তদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে।

কমলকুমার মজুমদার সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা 'উষ্ণীষ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৭ খ্রিঃ। ঐ পত্রিকাতেই 'লালজুতো', 'প্রিনসেস' ও 'মধু' ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার ও তাঁর ভাই নীরদ নাচ-গান, ছবি আঁকার স্কুল চালু করেছিলেন। কিছুদিন যাওয়ার পর লেখকের পরিবারে আর্থিক সংকট নেমে আসে। ১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ নাগাদ কমলকুমার মজুমদারকে রিখিয়া ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছে। তারপর কিছুদিন তিনি ব্যবসার কাজে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ পারিবারিক অর্থসংকটের চেহারাটা কিছুটা হলেও লাঘব হতে থাকে। এরপর তিনি কিছুদিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র বিষয়েও আলোচনা করেছেন। রিখিয়ায় থাকাকালীন কমলকুমারের বোন গীতা দেবীর সঙ্গে কলকাতারই মেয়ে দয়াময়ীর পরিচয় হয়। তারা যৌথ উদ্যোগে 'দেওয়াল' পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পর সাহিত্যমনস্ক দয়াময়ীর সঙ্গে ১৯৪৭ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার পারিবারিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৪৯ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদার সিগনেট প্রেস প্রকাশনার শিল্প উপদেষ্টার হয়ে কিছুদিন কাজও করেছিলেন। লেখকের পরিবারে অর্থনৈতিক হাহাকার থাকায় গৃহশিক্ষকতার কাজও তাঁকে করতে হয়েছিল। পরিবারের আর্থিক সুরাহার জন্য একই সঙ্গে তিনি জনগণনা দপ্তরেরও কাজ করেছেন। সেই সূত্রেই বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যেমন পরিচয় হয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জায়গায় লেখককে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এরপর তিনি কিছুদিন গ্রামীণ শিল্প ও কারিগরী বিভাগেও কর্মরত ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ খ্রিঃ নাগাদ কমলকুমার মজুমদার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিল্প শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, চিত্রনাট্যরচনা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। ১৯৫৭ খ্রিঃ – ৫৮ খ্রিঃ 'দেশ' পত্রিকায় কমলকুমার মজুমদারের লেখা 'মতিলাল পাদরী' ও 'তাহাদের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর 'নহবৎ' পত্রিকায় ১৯৬৯ খ্রিঃ 'অর্ন্তজলী যাত্রা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭৬ খ্রিঃ 'Arts and Crafts' নামে একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, ১৯৬৩ খ্রিঃ কমলকুমার মজুমদারের 'গল্পসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ গ্রন্থেই আমাদের আলোচ্য 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। কমলকুমার মজুমদারের লেখা গল্পের সংখ্যা উনত্রিশ। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'লালজুতো', 'মধুজল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী', 'তাহাদের কথা' 'ফৌজী বন্দুক', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'কয়েদখানা', 'বাবু', 'আমোদ বৌস্টমী' ইত্যাদি। কমলকুমার মজুমদারের লেখা উপন্যাসের সংখ্যা আট। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – 'অর্ন্তজলী যাত্রা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যাম-নৌকা', 'সুহাসিনীর পোমেটম', 'পিঞ্জরে বৈশা', 'সুখ', 'খেলার প্রতিভা', 'শবরীমঙ্গল' প্রভৃতি। কমলকুমার মজুমদার বিংশ শতাব্দীর ও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বলা হতো 'লেখকের লেখক'। অবশেষে ১৯৭৯ খ্রিঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করেন।

৩১০.২.৭.২ : গল্প পরিচয়—নিম অন্নপূর্ণা

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটি কমলকুমার মজুমদারের সৃজন প্রক্রিয়ার ফসল। গল্পটিতে বিশ শতকের চারের দশকে কলকাতার নিম্নবিত্ত পরিবারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি পরিবারের খাদ্যাভাসের ছবিটি 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে ফুটে উঠেছে। গল্প পাঠে আমরা জানতে পারি প্রীতিলতার সংসারে বড় অভাব। তার দুই মেয়ে যূথী ও লতি। কমলকুমার মজুমদার গল্পটি শুরু করেছেন এই ভাবে –''যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে সর্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়।'' প্রীতিলতার পরিবারের আর্থিক সংকটের ছবিটি ধরা পড়েছে উপরের উদ্ধৃতি থেকেই তা বোঝা যায়।

বাঙালি পরিবারের হাহাকার, শূন্যতা প্রীতিলতাকে জর্জরিত করে দিয়েছে। শত চেষ্টা করেও মেয়ে দুটিকে ঠিকমতো খাবারের সংস্থান করতে পারে না। পোশাক-পরিচ্ছদের দিক থেকে তাদের জীর্ণতা লক্ষ্য করা গেছে। তার উপর আবার প্রতিবেশী খেতুর মা-র দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। ''খেতুর মা যূথীর বেনীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, তোমার মেয়ে কি বলল বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকালে লোকে শুনলে বলবে খেতু মিত্তিরের মা কি লোক গা – ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরীর অদম গা...পাখীর ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে...মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম।'' বেচারী খেতুর মা বুড়ো মানুষ, তার শতছিন্ন কাপড়ের আঁচল। নিম্নবিত্ত পরিবারের দুর্দশার ছবি খেতুর মার চরিত্রের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। যূথী ও আর এরকম কাজ করবে না বলে ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল — ''তোমার পায়ে পড়ি আর করব না আ...করব না এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা — সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস হাভাতে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল — অজস্র ছেঁড়া – মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল-মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড়!'' প্রীতিলতার দীর্ঘদিন না খাওয়ার ফলে শরীরে কোন ক্ষমতা ছিল না। তার মেয়ে যূথীরও অবস্থা তথৈবচ, যূথীর মুখে প্রতিমুহূর্তেই না – পাওয়ার দুর্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা করুণ মর্মন্তুদ কাহিনী গল্পে ধরা পড়েছে।

''প্রীতিলতা অন্য আর একদিক থেকে নিশ্বাস নেবার জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাস্‌টে অন্ধকার – বালতি আর টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আর কোথাও যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই।'' খাদ্যের অভাবে প্রীতিলতার দেহটা যে যমত দেহ থেকে ছুটে বের হয়ে গেছে, শীর্ণকায় হয়ে গেছে। প্রীতিলতার দুই মেয়ে যূথী ও লতিও বুঝেছিল তারা বড় নিঃসহায়। 'হাভাতের মতো' আচরণ প্রীতিলতা একেবারে সহ্য করতে পারে না। সেইজন্য দুই মেয়েকে প্রতিমুহূর্তে সাবধান করে দেয়। আর কাউকে জানাতে নিষেধ করে যে তারা অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। তাদের বাড়িতে চোকর সিদ্ধ হয়, ভাতের থেকে চোকর তাদের খুব ভাল লাগে। দুঃখের সংসারে

ভাতের থেকে চোকর একশ গুণ ভাল। তা খেয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করে। তাদের অভাবের সংসারে ভাতের পরিবর্তে চোকর সিদ্ধ হয়, তা যেন কেউ না জানে। ''প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না...লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই। প্রীতিলতা সব কূল বজায় রেখে পারিবারিক মেলা মেশা করেছে। কিন্তু যত দিন গেছে, অভাবের সংসার তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। পরবর্তীকালে প্রীতিলতার বাড়ির দরজায় বুড়ো ভিখিরিকে দেখে প্রথমে তার দয়া হয়। ''বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী – লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে....বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।''

প্রীতিলতা ভিখিরি বুড়ো মানুষটির অর্থ, চাল সবকিছু আত্মসাৎ করতে চেয়েছে। কেননা প্রীতিলতার দুই মেয়ে যূথী ও লতি অভাবের সংসারে খাওয়া – খাওয়া খেলা খেলছিলো। তাদের খেলার মধ্যে কোন পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না। মেয়েগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে মা-বাবাকে গর্বিত করা। ব্রজর মনেও তখন কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা আত্মিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাদের পরিবারে সর্বত্রই হাহাকার নেমে এসেছে। উনুনে হাঁড়িতে জল ফুটছে, অথচ বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। সেই পরিস্থিতিতে প্রীতিলতাকে বলতে শোনা গেছে — ''আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই...খাই...কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন...''। প্রীতিলতার একথায় ব্রজরও যথেষ্ট লজ্জা হয়েছে। তাদের পরিবারে ভাত যদি থাকত তাহলে সে অনায়াসে এ যাত্রা উত্তীর্ণ হতে পারতো। ''প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।''

সেই সময় কলকাতার পরিবেশ – পরিস্থিতি খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। চারদিকে মন্বন্তরের অন্ধকার নেমে এসেছে। এ সময় শহরে একটা টিউশনি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। শহরের অনেকের পরিবারের কষ্ট দেখা গেছে কিন্তু কিছুতেই প্রীতিলতা হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। যতই মেয়ে দুটির ক্ষিদে পাক, সে কিছুতে নিজেদের অভাব লোককে জানতে দেবে না। আবার ব্রজর প্রতিও তার রাগ করার কিছু নেই। কেননা তার অক্ষমতা প্রীতিলতার সমস্ত স্বপ্নকে যেমন নষ্ট করেছে তেমনি তার জীবনকে পর্যন্ত বানচাল করে দিয়েছে। তখন প্রীতিলতার করুণ কণ্ঠস্বর ফাঁকা হাঁড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাত্র।

মরণাপন্ন বুড়ো মানুষটি রাস্তায় বসে কাশছে, তার গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। প্রীতিলতা বুড়ো ভিখিরি মানুষটিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। ''সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বারা কোনক্রমে রকের কিনারাটা ধরেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসের আলো ফেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল।'' প্রীতিলতার ভাতের হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন দিয়েছে। আর বুড়োটির সংগ্রহ করা চালগুলি নিয়ে কয়েকদিনের উপবাস ভঙ্গ করেছে। ''গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, হ্যাঁ কোথায় পেলে...''। গরম ভাতের থালার সামনে বসলেও সে ভাত মুখে তুলতে পারেনি। তবুও দরিদ্র পরিবারে একটু সুখ-শান্তি-তৃপ্তি নেমে এসেছে। অনেকদিন পর তারা গরম ভাতের স্বাদ পেয়ে

মহা আনন্দে খেতে বসেছে। কিন্তু ''অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ – খোরাকী গলায় বলেছিল, বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে.....খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...''।

৩১০.২.৭.৩: নামকরণ

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নামকরণ প্রতীকী অবশ্যই। কেননা ভারতীয় পুরাণের মা অন্নপূর্ণার মতো মুক্তহস্তে সবকিছু দান করতে পারে না এ গল্পের প্রীতিলতা। সমাজের বহুবিধ সংকটের কারণে, প্রীতিলতা পরিবারকে সুস্থভাবে পরিচালনাও করতে পারে না। পরিবেশ – পরিস্থিতির চাপে সর্বত্রই দুঃখের হাহাকার লক্ষ্য করা গেছে। সেইজন্য প্রীতিলতা প্রতিবেশী কাউকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েও দিতে পারে না। বরঞ্চ গল্পে দেখা গেছে এক বৃদ্ধর সংগ্রহ করা চাল ছিনতাই করে নিয়েছে। ''আজ খুব বরাত ভাল – চাল পেয়েছি, বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। একি চাল কোথায়...'' প্রীতিলতা সেই চাল দিয়ে তার পরিবারের বুভুক্ষ মানুষগুলির মুখে হাসি ফুটিয়েছে। অপরদিকে প্রীতিলতার পাশবিক অত্যাচারে বুড়োটা শেষ পর্যন্ত মারা গেছে। কলকাতার দুর্ভিক্ষেরা পরিবেশে প্রীতিলতা মান সম্মান নিয়ে যেমন খাদ্যসংগ্রহের জন্য লঙ্গরখানায় লাইনে দাঁড়ায়নি, তেমনি নিজের দুঃখের কাহিনি প্রকাশ করেও হাভাতে হতে চায়নি। গল্পের শেষে তবু 'হাভাতের মতো' মানুষদের কাজ করতে প্রীতিলতা বাধ্য হয়েছে। জীবনে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য, নিরুপায় হয়ে এই জঘন্য কাজও তাকে করতে হয়েছে। সর্বত্রই প্রতিকূল পরিস্থিতি, সেই অবস্থায় মাথা উঁচু করে বাঁচতে প্রীতিলতা বৃদ্ধ ভিখিরির চাল ছিনতাই করতে বাধ্য হয়েছে। গল্পকার কমলকুমার মজুমদার গল্পের শেষে ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে নামকরণকে ইঙ্গিত করেছেন। গল্পের শেষে দেখা যায় – প্রীতিলতার মন দুঃখে – অনুশোচনায় ভরে উঠেছে। তাকে বলতে শোনা গেছে — ''অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ — খোরাকী গলায় বলেছিল, বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে – খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...''। তাই 'নিম অন্নপূর্ণা' নামের ব্যঞ্জনা অনেক বড় তাৎপর্যে দীপিত হয়ে ওঠে পাঠকদের কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অর্থনৈতিক সংকট, বেকার সমস্যার কারণে অনেক মানুষকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা শহরে আসতে হয়েছে। ঐ নিরাশ্রয় মানুষগুলির অস্তিত্বের সংকটকে কমলকুমার মজুমদারের মনে গভীর ছায়া ফেলেছে। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, মজুতদারীর ফলে ঐ নিরন্ন মানুষগুলির জীবনসংশয় গল্পকার 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে তুলে ধরেছেন। এমনকী ঐ পরিবেশ–পরিস্থিতিতে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মা অন্নপূর্ণার মতো খাদ্যের থালা হাতে কাউকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে দেখা যায়নি। গল্পের নায়িকা প্রীতিলতাও পারেনি সবুজ মন নিয়ে কলকাতার পারিবারিক সংকটের চেহারাটিকে পালটে দিতে। সর্বোপরি 'নিম অন্নপূর্ণা' নামের প্রতীকী ব্যঞ্জনা গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছে।

৩১০.২.৭.৪ : চরিত্র চিত্রণ

'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে কমলকুমার মজুমদার শিক্ষিত নগরবাসী নিম্নবিত্ত মানুষদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পের সৃষ্ট চরিত্রগুলি মূলত জীবনমুখী। বিশ শতকের চারের দশকের কলকাতার জনজীবনে সাধারণ মানুষের সমস্যাকে লেখক নিপুণ তুলিতে অঙ্কন করেছেন। প্রীতিলতার দারিদ্র্য পূর্ণ জীবন 'হা ভাতে' হলেও একটা সময়ে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য বৃদ্ধ ভিখিরিকেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তাঁর সংগ্রহ করা চাল ও টাকা লুঠ করে নিয়েছে। প্রীতিলতার মেয়ে যূথী ও লতির চরিত্র-চিত্রণে গল্পকার কমলকুমার মজুমদার মানুষের অস্তিত্বের সংকটকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

৩১০.২.৭.৫ : গদ্যভাষা

কমলকুমার মজুমদারের ভাষাশৈলী নির্মাণে তাঁর দক্ষতা বাংলা সাহিত্যের অনেক পাঠককেই যেমন আকর্ষণ করেছে। তেমনি অনেককেই বিমুখ করেছে। এ কারণেই অনেক পাঠকের কাছে তাঁর ভাষা প্রবল বির্তক তৈরি করেছে। সাহিত্য সৃজন প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তুর থেকে সরে গিয়ে গদ্যশৈলী একটা আলাদা মাত্রা দান করেছে। কমল কুমারের রচনাশৈলী, গদ্যরীতি, জীবন দর্শন সর্বত্রই বাংলা কথাসাহিত্যের একজন মৌলিক ভাবনার লেখক বলেই স্বীকার করতে হয়। সর্বোপরি বলা যায় কমলকুমার মজুমদারের রচনা বাংলা সাহিত্যের পাঠককে নতুন ভাবে ভাবিত করেছে।

কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতির জটিলতার কারণগুলি হল —

ক) কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্প ও উপন্যাসে দীর্ঘবাক্য গঠন করেছেন।

খ) কথাসাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদার শব্দ ও বাক্য ব্যবহার ছাড়াও প্রেক্ষিত নির্মাণ এবং দৃশ্য বা ভাবনা বর্ণনা করতে গিয়ে দুর্বোধ্য উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার তাঁর রচনাকে করে তোলে পর্বত প্রতিম দুর্ভেদ্য।

গ) ব্যাকরণের কোন নিয়ম শৃঙ্খলা তাঁর কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায় না। শব্দকে এখানে-সেখানে বসিয়ে শব্দের বহুতর মাত্রা যোগ করেছেন। সর্বোপরি বলা যায় তিনি কঠিন করে লেখেন। খুব সহজ, তরতরে লেখা তাঁর গদ্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

ঘ) কমলকুমারের উপন্যাসে, গল্পে বা প্রবন্ধে যেসব পদবিন্যাস দেখা যায়, তা ''ফরাসী ঘেঁষা' অনেকে মনে করেন।

ঙ) কমলকুমার মজুমদার ভাষার বর্ণনাত্মকতার সঙ্গে নানা শিল্প মাধ্যমের অনুষঙ্গ ও সূক্ষ্মতা আরোপ করে ভাষাকে রূপাত্মক করে তুলেছেন। তাঁর গদ্যরীতি বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ একক। কমলকুমার একবার সাধু গদ্যরীতিতে লেখা শুরু করার পর আর চলিত ভাষার গদ্যরীতিত লিখতে পছন্দ করেননি। কমলকুমার মজুমদারের গল্প – উপন্যাসে আরাধ্য দেবদেবী ও গুরুপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ প্রার্থনা

করা হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটির সূচনাতে কোন ধর্মীয় সম্বোধন লক্ষ্য করা যায় না।

৩১০.২.৭.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠিত করো।

২। কমলকুমার মজুমদারের জীবনদর্শন 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট করো।

৩। কমলকুমার মজুমদারের 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের গদ্যভাষা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পের নারী চরিত্রগুলির পরিচয় দাও।

৩১০.২.৭.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী।

২। বাংলা ছোটগল্প - শিশিরকুমার দাস।

৩। ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ - বীরেন্দ্র দত্ত।

৪। বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি - সোহারাব হোসেন।

একক - ৮

গিরগিটি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বিন্যাসক্রম

৩১০.২.৮.১ : গল্পকার পরিচিতি

৩১০.২.৮.২ : গল্প পরিচয়

৩১০.২.৮.৩ : নামকরণ

৩১০.২.৮.৪ : মনস্তাত্ত্বিক গল্প

৩১০.২.৮.৫ : চরিত্র পরিচয়

৩১০.২.৮.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.২.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.২.৮.১ : গল্পকার পরিচিতি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। লেখকের জন্ম ১৯১২ খ্রিঃ ২০ আগস্ট বাংলাদেশের কুমিল্লার মাতামহের সরকারি আবাসে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পিতা অপূর্বচন্দ্র নন্দী, মাতার নাম চারুবালা দেবী। জন্মের কিছুদিন পরেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চলে আসেন কুমিল্লার মহকুমা শহরে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণবেড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক। লেখকের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণবেড়িয়া মাইনর স্কুল থেকে। প্রকৃতি প্রেমিক কথাসাহিত্যিক প্রকৃতির মুগ্ধতায় বিভোর হয়ে থাকতেন। প্রকৃতির রূপ খুব কাছ থেকে তিনি দেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাষায়— "একটু বড় হয়ে দেখলাম, চমৎকার ওই মফস্বল শহর। তখন একটু — একটু দেখতে শিখেছি— একটু একটু বুঝতে শিখেছি। কোর্টকাছারি, হাসপাতাল, বাজারের পরিবেশে আমাদের বাসা ছিল। ওর গণ্ডি পার হলে একদিকে শান্ত-স্নিগ্ধ তিতাস নদী, অন্যদিকে ধানক্ষেত, পাট ক্ষেত এবং এই ছোট্ট শহরটা ঘিরে অফুরন্ত সবুজের সমারোহ,এসব দেখতে খুব ভালো লাগতো। পুকুরঘাট, ডালপালা ছড়ানো ঝুপসি মতো শ্যাওড়াগাছ, লাল ফড়িং এর

ওড়াউড়ি, তিতাসের বুকে নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতা, দুর্গা প্রতিমার ভাসান। মৌরলা খলসের আঁশটে গন্ধ, ভোরের বাতাস— এসব নিয়েই আমার ছোটবেলা।"

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। ১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ তিনি কাজের সন্ধানে কলকাতায় পা রাখেন। বেঙ্গল ইমিউনিটিতে তিনি প্রথম কাজে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে টাটা এয়ারক্রাফট, জে ওয়ালটার থমসনের পাশাপাশি কাজ করেছেন যুগান্তর সংবাদ পত্রের সাব এডিটর হিসেবে। পারুল দেবীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিবাহ হয়েছিল। সংকটময় পরিস্থিতিতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'জ্যোৎস্না রায়' ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রথমে অনুবাদমূলক গল্প রচনায় হাত দিয়েছিলেন। মোপাসার লেখা ছোটগল্প 'জার্নালিস্ট' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। 'পরিচয়' সাময়িক পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা 'নদী ও নারী' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে ভালোবাসা পেতে থাকেন। ধীরে ধীরে লেখকের নাম পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা গল্পগুলি হলো— 'ভাত ও গাছ', 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'নীলপেয়ালা সিঁদেল', 'এক ঝাঁক দেবশিশু', 'নীলফুল' এবং 'বলদ'। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'সূর্যমুখী', 'মীরার দুপুর', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসগুলি পাঠকদের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসাময়িক সাহিত্যিক ছিলেন— বিমল মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— 'নদী ও নারী', 'রাইচরণের বাবরি', 'সমুদ্র', 'বৃষ্টির পরে', 'বনের রাজা', 'বন্ধুপত্নী', 'গিরগিটি', 'শ্বাপদ', 'তারিণীর বাড়ি-বদল', 'মঙ্গলগ্রহ', 'চোর', 'নীলপেয়ালা', 'চন্দ্রমল্লিকা,' 'পার্বতীপুরের বিকেল', 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', 'পতঙ্গ', 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', 'জ্বালা', 'সামনে চামেলি', 'গাছ' প্রভৃতি।

কল্লোল যুগের অন্যতম ছোটগল্পকার— জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রয়াত হয়েছিলেন ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট।

৩১০.২.৮.২ : গল্প পরিচয়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পটি আমাদের পাঠ্য। 'গিরগিটি' গল্পটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে নিতাই বসুর সম্পাদনায় কলকাতা পুস্তকমেলা থেকে "জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প" গ্রন্থে 'গিরগিটি' গল্পটি স্থান পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'গিরগিটি' গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে— "সস্তা টিনের ঘর হলেও বাড়িটা তার ভালো লাগে। লোকজন নেই বললেই

চলে। মোটে আর— একঘর ভাড়াটে। তাও ঠিক পাশাপাশি ঘর না। উঠোন পার হয়ে বা দিকের রানা জিরজিরে, একটা দেওয়াল ঘেষে ডুমুর আর পেপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালার একটা খুপরি নিয়ে বুড়ো মানুষ টা ওধারে পড়ে আছে। ওর থাকা না- থাকা সমান কথা।" বরদাসুন্দর বটব্যালের শহরতলির নির্জন বাড়িটি দুই বছরের বিবাহিত জীবনের দম্পতি মায়া ও প্রণব বাড়িভাড়া নিয়েছে। তাদের পাশেই ভুবন সরকার নামে এক বৃদ্ধ ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে। গল্পকার মানুষের হাহাকার, সময়ের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন নিপুন পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে। ভুবন সরকারের প্যাকাটির মতো সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর। তার মাথার চুল শনের মতো পাঁকা, চোখ দুটি হলদে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুড়োর দুটো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা শিরা বেরিয়ে গেছে। ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি,মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনো কখনো ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙ্গা পাঁচিলটা কি পেঁপে —জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষত চিহ্ন যুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে। এর বেশি না। "দুবছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ করে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা। তুলনাটা মনে করে মায়া হাসল।" মায়া আর প্রণব ছাড়া তাদের পরিবারে আর কেউ ছিল না। প্রণব সেই সাত সকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে,কিছু একটু খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। বাড়ি ফিরে আসে আবার সেই বিকেল পাঁচটার সময়। মায়ার সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে। প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে কি সব ভাবতে থাকে সারাদিন। "সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাতদিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়ার এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর কোনো পুরুষের চোখেমুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল না শুনল না। যদি দেখত, শুনত তবে কি সে রাগ করত? মায়া ঠিক ভেবে পেল না।" মায়ার মনে হয়েছে—প্রণবের কথা,হাসি,ওঠা-বসা,খাওয়া-বিশ্রাম,সিগারেটের গন্ধ,অফিসের গল্প মায়ার কাছে একঘেয়ে লাগে। প্রণবের সংসারে মায়া এসব কতকাল ধরে বয়ে বেড়াচ্ছে। মায়ার সারাদিন তাই কোনো কাজ থাকে না। নিজের রূপে বিভোর মায়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বারবার দেখে। কখনো ঘরের আয়নায়, কখনো জলের আয়নায় নতুন করে সে নিজেকে দেখে। "যেন চিনতে পারা যায় না, এ- মায়া সেই মায়া, এই কপাল, সেই কপাল, এই থুতনি, এ-বুক সেই বুক। কি, ঘরের আরশিতে এইমাত্র সে যা দেখে এসেছে। যা সুন্দর শক্ত জমাট আর এখানে জলের অন্ধকারে তা কেমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে।"

বরদাসুন্দর বটব্যালের ভাড়া বাড়িতে মায়া আত্মমগ্ন হয়ে প্রকৃতির রূপ দেখতে থাকে। এখানে খোলা হাওয়া আর ঘাসের শিসের দোলানি আর নিমগাছ থেকে ভেসে আসা পাকা নিমফলের গন্ধে মায়া বিভোর হয়ে থাকে। "হাজার পাতার চোখ মেলে নিমগাছটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, পেঁপে গাছগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাঙ্গা পাঁচিল মরা গাছ কাক শালিক বুলবুলির ঝাঁক যখন —তখন মায়ার হাত দেখছে পা দেখছে হাঁটু দেখছে পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ সব। রাগ করে নাও, বরং খুশি হয়। যদি ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে না থাকত তো তার মনে হত না সে বেঁচে আছে।" বাড়ির কাছেই বুলবুলির কিচিরমিচির আশ্চর্য নির্জন জগতে মায়া প্রবেশ করে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকে। অন্যমনস্ক ভাবে মায়া প্রণবের কিনে

দেওয়া সাবানটি কুয়োতলায় বসে মাখতে পারে। তাকে বিরক্ত করার মতো কেউ আছে বলে মনে হয় না। তবে মায়া কার দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিল,তার উত্তর মায়ার কাছে পরিস্কার নয়। সেই পরিস্থিতিতে মায়ার শরীর শিরশির করে উঠেছে। এমন সময় মায়া চমকে উঠে দেখেছে,শুকনো পাতার উপর দিয়ে ভুবন সরকার হেঁটে চলে গেল। বরদাসুন্দর বটব্যালের সাড়ে বারো টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্য-গণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মায়া ভুলে যায়। ভুবন সরকার মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "ভাবলাম আপনার চানটা হোক, হাতের কাজটা সেরে ফেলি,আর এর মধ্যে কিনা চোখটা লেগে গেল।" তখন মায়া বলেছে আমার স্নান হয়ে গেছে, আপনি কুয়োতলায় গিয়ে স্নান করে আসুন। মায়া, ভুবন সরকারের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে ভেবেছে— "শুকনো মরা গাছ দেখে যেমন ভয় বা লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন মনে জাগে না এখানেও তাই। শূন্য হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ভুবন ওর চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে যেন কি বলি-বলি করছে।"বাদলা দুপুরের পচা ভ্যাপসা গরম তার ওপর ভুবনের পুরোনো ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে অস্বস্তিকর পরিবেশে মায়া ঘেমে উঠেছে। প্রণবের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মায়া বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। "তুমি যে আমার কথা মনে কর না তা আমি কখনো মনে করি না। বরং দুঃখ, একটু বেশি মনে রাখো বলে। একটু কম করে যদি রাখতে আমি সুখী হতাম। আমার জীবন সুখের হত।" আত্মরূপ মুগ্ধ মায়া প্রণবের সঙ্গে সংসার করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই মায়া প্রকৃতিকে উৎসর্গ করেছে নগ্ন স্নান দৃশ্য। প্রণব মায়ার মনের ভাব বুঝতে পেরেছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে রকম দৃষ্টি, সেই চোখ। মায়ার সেই রূপ দেখে, ভুবন খুশি হয়েছে। কালো চোখের মধ্যে আগুনের নাচ দেখতে পেয়ে মুখটা মুখের কাছে সরিয়ে এনেছে। ভুবনের কথায়— "দিদির চোখ জোড়া আরো আরো সুন্দর ভয়ানক লাগছে এখন।" যেন বাঘিনী শিকার ধরেছে।খুশীর রক্তে দু'চোখ লাল। খসখস করে মায়ায় দিকে তাকিয়ে ভুবন হেসে চলেছে। ভুবন সরকারের চোখে মায়া যেন এক ডালিম চারা। 'গিরগিটি' গল্পে দেখা যায় — "চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ে সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল। আঙুল ছেয়ে, নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলমিলি, হাওয়ায় দুলছে নড়ছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুল বিলি কাটছে আর খিল খিল হাসছে। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দুবার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পনে দুবার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিল খিল হাসল। ছোট্ট একটি নিশ্বাস পড়ল মায়ার।"মায়া, প্রণবকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে সে অন্য রুচির মানুষ। সুখী নয়, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না। তার বন্ধুরাও বলে, কেন সুখী নয়,কি দিয়ে সুখী নয়,তার চুলচেরা হিসাব অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। সেই পরিস্থিতিতে প্রণবের আর কিছু করার নেই। এক টুকরো কান্না বুকে নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে সে আকাশের দিকে তাকিয়েছে। প্রণব অভিমানের সুরে বলেছে, আমি আর দেখতে চাই না সেই রূপ। মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, "বেশ তো যাকে ভালো লাগে তাকে দেখাও তার সামনে সব খুলে মেলে দাঁড়াও।" তখন শিহরণে মায়ার পৃথিবী বদলাতে শুরু করেছে। ক্রমশ স্বামীর আচার-ব্যবহার মায়ার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মায়ার রূপ কাকে দেখাচ্ছে, প্রণব তার সন্ধান নেওয়ার

চেষ্টা করলে হয়তো পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যেত। প্রণবের মনেরও উন্নতি লক্ষ্য করা যেত। রোজ রাত্রে মায়ার জন্য প্রণব হ্যাংলামো করতো না। ক্রমশ স্বামীকে মায়া দূরে ঠেলে দিয়েছে। মায়া, প্রণবকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেছে— "হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ে গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।"

'গিরগিটি' গল্পটি পাঠ করে আমরা জানতে পারি, বরদাসুন্দর বটব্যালের সাড়ে বারো টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্য-গণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পরিচয় সম্পর্কে মায়া ভুলে যায়। ভুবন সরকারের ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি ও মন্থর গতিতে চলার সঙ্গে এমন একটা কিছু মিশে আছে যা মায়াকে নতুন উদ্দমে বাঁচতে শেখায়। সেইপরিস্থিতিতে মায়ার পেঁপে জঙ্গলের পাশের নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মৃত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে। মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। সেইপরিস্থিতিতে মায়াকে সে কখনো বলেছে, দিদির থুতনি যেন মচকা ফুল — না না না,করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে, অবিকল সে রকম। কিম্বা দিদির ছুটে যাওয়া যে রাজহংসীর গতিভঙ্গি। কখনো বলেছে লাল দোপাটি দিদির বেণীতে মানাবে ভালো। ভুবন, মায়ার জন্য বৌ বাজার থেকে দোপাটির মালা কিনে নিয়ে এসেছে। মায়া দোপাটির মালাটি পরে বাইরের উঠোনের দিকে পায়চারি করেছে। মায়া লক্ষ্য করেছে, জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলি চিকচিক করেছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রূপালি জল ঝরছে।

ভুবন সরকারের পরিবার ছিল কিনা মায়া তা জানার চেষ্টা করেছে। ভুবন বলেছে— সবই ছিল; তবে সেসব ইচ্ছে করে তোমাকে বলিনি। অতীতের কথা টেনে এনে কি লাভ, কি হবে বলে। ভুবনের পারিবারিক সংকটের কারণে তিন-তিনটা বউ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। "প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হু মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তাও তো ক'বছর হয়ে গেল।" তিনবার বিবাহ করেছে, চতুর্থ বার ভুবনের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। উল্টোডাঙ্গার শশীর হাতে বিধবা ভাগ্নীর মেয়ে রয়েছে। যুবতী মেয়ে বলে ভুবন সরকারের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তাগাদা দিয়ে চলেছে। মায়াকে উদ্দেশ্য করে ভুবন সরকার বলেছে— "তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি। মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।" ভুবনের কাছ থেকে এই কথা শোনার পর মায়া আত্মমগ্ন হয়ে প্রকৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর পাথরের মতন স্থির হয়ে গেল। মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেয়ে সোজা হয়ে বসে পড়েছে। তখন মায়াকে দেখতে অসহায়ের মতো মনে হয়েছে। ভুবন সরকার মায়াকে বলতে শুরু করেছে— "কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না? যেন এই প্রথম ভুবনের গলায় দুঃখের আওয়াজ বেরোলো। বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে করে রেখেছি। ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।" উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় ভুবন সরকার মায়ার শরীরী সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সৌন্দর্য রসিক ভুবন সরকারের চোখে প্রকৃতির

রূপ-রস-গন্ধ বাদ দিয়ে মায়ার প্রতি কামনা-বাসনা লক্ষ্য করা গেছে। সেইজন্য মাঝরাতে নিদ্রিত স্বামী প্রণবের পাশ থেকে উঠে গিয়ে ভুবনকে মায়া বলেছে — এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো,কেমন দেখাচ্ছে? বৃদ্ধ ভুবন সরকারের বুকে তীব্র সৌন্দর্য পিপাসার জন্যে মায়াকে তার মনে হয় যেন ডালিমচারা, মায়ার থুথনির সঙ্গে কখনো মচকা, কখনো করবী ফুলের মিল খুঁজে পায় সে।

প্রকৃতির আঙিনায় বসবাস করে ভুবনের মন সৌন্দর্য চেতনায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। মায়ার স্বামী প্রণবের মতো ভুবনের শারীরিক সৌন্দর্য দেখার নেশা তীব্র নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে প্রণব, মায়াকে ধরতে পারে না। প্রণবের চোখে মায়ায় রূপ ধরা পড়েনি। সে কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না। মায়ার রূপের কদর করতে জানে বৃদ্ধ ভুবন সরকার। 'গিরগিটি' গল্পের শেষে দেখা যায়— "যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁতকে উঠেছিল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হতে দিলে না। ভয় কান্না দুটোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি বলুন?"

৩১০.২.৮.৩ : নামকরণ

আমাদের পাঠ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখা গল্পটির নাম 'গিরগিটি'। গিরগিটি বলতে অভিধানে রয়েছে, টিকটিকি আকারের এক ধরনের সরীসৃপ। গিরগিটি সহজে কাউকে কামড়ায় না। ভুলবশত কাউকে কামড়ালেও এদের কামড় সম্পূর্ণ বিষহীণ। গিরগিটি নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করতে, অন্য গিরগিটিকে ভয় দেখাতে এমনকী প্রজননের সময় পুরুষ সঙ্গীকে ইমপ্রেস করতে রঙ বদলায়। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকার জন্য এটা বাড়তি সুবিধে গিরগিটি প্রজাতির।

সাহিত্যে নানা ধরণের নামকরণ হয়ে থাকে। বিষয়গত নামকরণ, চরিত্রগত নামকরণ, ঘটনাগত নামকরণ, প্রতীক বা ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। আমাদের পাঠ্য 'গিরগিটি' গল্পটিতে লেখক গিরগিটি শব্দটির তিনবার ব্যবহার করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পের বরদাসুন্দর বটব্যালের জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িতে বিবাহিত দম্পতি প্রণব ও মায়া ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেছেন। তাদের প্রতিবেশী বুড়ো ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ভুবন সরকার। শীর্ণ দেহে, ফ্যাকাশে চোখের এই বুড়োকে মায়ার কখনই মনে হয়না লোকটা একজন মানুষ,একজন পুরুষ। বার্ধক্যজনিত কারণে ভুবন সরকারের বয়স অনেক। লেখকের মতে গিরগিটির মতোই ভুবন বহুরূপী। ভুবন সরকার এই বয়সে তিনবার বিয়ে করেছে কিন্তু একজনও তার সঙ্গে সংসার করেনি। "প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হু মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তাও তো ক'বছর হয়ে গেল।" সৌন্দর্য রসিক ভুবন সরকারের চতুর্থবার বিয়ের আগ্রহ ধরা পড়েছে উল্টোডাঙ্গার শশীর কথাতে। হু, একটা সোমত্ত মেয়ে আছে ওর হাতে। মায়া,ভুবন সরকারের বিয়ের আগ্রহের কথা শুনে রাগ করেছে। অভিমান করে বলেছে আর

এই বিয়েতে রাজী হবেন না। তার উত্তরে মায়াকে উদ্দেশ্য করে ভুবন সরকার বলেছে— "তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি। মুখের কাছে মুখ সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।" গিরগিটি সরীসৃপ প্রাণী নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রঙ পাল্টায়। কিন্তু মানুষ তার নিজের স্বার্থের জন্য রঙ পাল্টায়। রঙ তো মানুষই বেশী বদলায়,নাম হয় শুধু গিরগিটির। আমাদের পাঠ্য গল্পের ভুবন সরকারের চরিত্র বহুরূপী প্রকৃতির।

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে ভুবন সরকার মায়াকে যতবার দেখেছে, ততবারই মুগ্ধ হয়েছে। মায়াকে লক্ষ্য করে ভুবন সরকারকে বলতে শোনা গেছে— "বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে,কিন্তু ভেতরে রসের বাল্ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি। দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।" সৌন্দর্য রসিক ভুবন সরকার মায়াকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। দৈহিক কামনা- বাসনার উর্দ্ধে উঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুধা পান করতে চেয়েছে। তিনবার বিবাহিত ভুবন সরকারের মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ভুবন সরকার 'গিরগিটি' গল্পে গিরগিটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইদিক থেকে গিরগিটি নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

অপরদিকে মায়া দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। দু'বছরের দাম্পত্যজীবনে প্রণবের মুখে রাতদিন রূপ যৌবনের কথা শুনে মায়া ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রণবের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মায়া প্রকৃতিকে উৎসর্গ করেছে নিজের স্নানের দৃশ্য। প্রণবের শারীরিক চাহিদা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সৌন্দর্য রসিক ভুবন সরকারকে মন দিতে পিছপা হয়নি। কেননা ভুবন সরকারের বয়স হলেও এখনো তারমধ্যে যে সৌন্দর্যতৃষ্ণা রয়েছে,তার সন্ধান পেয়েছে মায়া। সেইজন্য উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে মায়া হাসতে লাগলো। সেই পরিস্থিতিতে ভুবন সরকারকে উদ্দেশ্য করে মায়া বলেছে— "বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন? এই গল্পে মায়া ও নিজের স্বার্থের জন্য রঙ বদলাতে শুরু করেছে। মানুষ যে কোনো অবস্থায় সুখী নয় তা গল্পটি পাঠ করে আমরা অনুভব করতে পেরেছি। মানুষের গিরগিটির মতো রঙ পালটানোর জন্যেই নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবনে সংকট নেমে আসে। গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'গিরগিটি' গল্পে মায়ার জীবনের পরিবর্তনকে সুন্দরভাবে নিপুণ তুলিতে আঁকার চেষ্টা করেছেন।

৩১০.২.৮.৪ : মনস্তাত্ত্বিক গল্প

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আধুনিক জীবনে মানব মনের জটিলতাকে লেখক চুলচেরা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। নৈতিক সংকটে আবদ্ধ মানুষের চেতন-অবচেতন রূপের পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গল্পে দেখা যায়— "এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপটায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে

জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।" ভুবন সরকারের মনের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে সুন্দর মানসিকতার মধ্য দিয়ে। কুয়োতলায় মায়া নিরাবরণ হয়ে স্নান করেছে,সেই দৃশ্য দেখে ভুবন সরকারের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন— "তার গায়ের মসৃণ চামড়ার উপর শুভ্র সাবানের ফেনার সৌন্দর্য দেখে বুড়োটা মুগ্ধ। এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্য — দৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতী বৌটি ও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ,জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ ছবি।" (পৃষ্ঠা-৩৭৫) তিন বার বিবাহ করার পর একটি বউও সংসার করেনি। পারিবারিক সংকটে আবদ্ধ ভুবন সরকারের মনের সৌন্দর্য দেখে মায়া দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানব-মনের, কামনা —বাসনা, লোভ- লালসাকে গিরগিটি গল্পের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি —প্রকৃতি' গ্রন্থে সোহারাব হোসেন বলেছেন— "যৌন — চেতনার নতুনত্ব চল্লিশের দশকের বাংলা ছোটগল্পের আর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। কল্লোলীয় যৌনতার বিকার অপসারিত হয়ে বহুধাগতির যৌন মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে চল্লিশের বেশ ক'জন গল্পকার আগ্রহী হলেন। এ- ধারায় যেমন হিংস্র যৌনতার গল্প ('শ্বাপদ', 'পতঙ্গ' —জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী) রচিত হল, যেমন সমকামিতার পথ ধরে বাউলের দেহতত্ত্বময় যৌন- ভাবনার গল্প ('দুকান কাটা', 'স্তনদ্বয়'- অন্নদাশংকর রায়) লেখা হল, তেমনি সম্পূর্ণ নতুন ভাবের যৌনচেতনার গল্পও ('আত্মজা'-বিমল কর) দেখা গেল।" (পৃষ্ঠা-১৬৩)

৩১০.২.৮.৫ : চরিত্র-পরিচয়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পে মূল তিনটি চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তারা হলো- প্রণব, মায়া এবং ভুবন সরকার। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' গল্পে বরদাসুন্দর বটব্যালের শহরতলির বাড়িতে বিবাহিত দম্পতি প্রণব ও মায়া বসবাস করে। তাদের প্রতিবেশি ভুবন সরকার ইলেকট্রিক মিস্ত্রী।

মায়া : দুইবছরের বিবাহিত জীবনে সে সুখী নয়। তাই দাম্পত্য সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায়। মায়া-প্রণবের দাম্পত্য জীবনে একঘেয়েমি চলে এসেছে। সেইজন্য প্রণবের মুখে রাতদিন রূপ- যৌবনের প্রশংসা শুনতে মায়ার ভালো লাগে না। প্রণবকে উদ্দেশ্য করে বলেছে- "সেই চিন্তা সেই ধ্যান তোমার। এই জন্যেই ঘরে আলো রেখে নিজেকে আমি দেখাতে চাই না।" প্রণবের জীবন ধারণ পদ্ধতি মায়ার মোটেই ভালো লাগে না। মায়া বরঞ্চ নিজের রূপ নিজেই দেখাতে থাকে। কুয়োতলায় স্নানের সময় সে মুক্ত হয়ে স্নান করতে থাকে। কখনো কখনো প্রকৃতির কাছে নিজে এসে ধরা দিয়েছে। হ্যাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই,বাতাস এসে আমার গায়ে গন্ধ শোঁকে,গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।"

প্রণব : মায়ার স্বামী প্রণব অফিসে কাজ করে। প্রণব সেই সাতসকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। দুইবছর হলো তাদের বিয়ে হয়েছে। সারাদিন পরিশ্রম করার পর প্রণব দৈহিক

মিলন পছন্দ করে। মায়া কিন্তু তার বিপরীত। মায়ার সৌন্দর্যচেতনা দেখার অনুভব ক্ষমতা প্রণবের মধ্যে নেই। "না না রিয়্যাল বলছি। আমি যে অন্যায় কিছু করছি না; আমি যে, আমিও যে তোমার মতন বা ইরের এত লোকের এত সব কীর্তি কত বেশি অপছন্দ করি এটা তোমার কাছে প্রমাণ দিতে তোমাকেই দেখতে চাই। এর চেয়ে পবিত্র কাজ আমার পক্ষে আর কি আছে তুমিই তার রায় দাও।"

ভুবন সরকার : ভুবন সরকার পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। বয়সে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে প্যাকাটির মতো সরু জিরজিরে হাত পা,শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর। ভুবন সরকারকে মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ,একজন পুরুষ। শুকনো মড়া কাঠের মতো ভুবন সরকারের চেহারা। মায়া প্রকৃতিকে উৎসর্গ করেছে তার নগ্ন স্নান দৃশ্য। কুয়োতলায় মায়ার স্নান করার দৃশ্য ভুবন সরকার লক্ষ্য করেছে। তার জন্য ভুবন সরকারের মনে কোনো অপরাধ বোধের সৃষ্টি হয়নি। হলদে ফ্যাকাশে চোখের চাউনিতে ভুবন সরকারকে অন্য ধরনের মানুষ বলে মনে হয়। ভুবন সরকার শুধুমাত্র হাঁ করে তাকিয়েছিল, আর মায়াকে লক্ষ্য করে মায়ার মুখের হাসি দেখছিল। গল্পে দেখা যায়— "গায়ে জল ঢালার আগে বুকের আঁচলটা আবার কোমরে জড়াতে জড়াতে মায়া ভাবে। এ বাড়ির ভাঙা পাঁচিল মরা গাছ কি ছাতাপড়া পুরোনো ইটের পাঁজার সঙ্গে যে লোকটার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মায়া পরিতৃপ্ত ছিল আজ তাকে হঠাৎ আলাদা করে দেখতে যাওয়া কি তার পায়ের শব্দে গা ঢেকে ফেলার মধ্যে কি একটা নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল না?" কুয়োতলায় জল নিতে এসে ভুবন সরকার মায়ার স্নান দৃশ্য দেখে মনে মনে শুধু হেসেছে। তিনবার বিয়ে করার পর, কোনো স্ত্রী তার সঙ্গে সংসার করেনি। একে একে সবাই ভুবন সরকারকে ত্যাগ করে চলে গেছে। আর এখন কিনা মায়ার রূপ যৌবন দেখে মৃত মাদারের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেছে। মায়াকে দেখে ভুবন সরকারের মনে হয়েছে, "দিদির থুতনি যেন মচ্‌কা ফুল—না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে-অবিকল সে রকম।" মায়া শান্ত স্থির চোখে ভুবনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ভুবন সরকারের মুখে মায়ার রূপের প্রশংসা শুনে মায়া আনন্দিত হয়েছে। দু'জনে কাছাকাছি বসে গল্প করেছে ঠিকই,তবে মায়া ভুবনের চোখে কামনা-বাসনার রং দেখতে শুরু করেছে। চতুর্থবার ভুবন সরকারের বিয়ে করার ইচ্ছেকে মায়া গুরুত্ব দিতে নারাজ। ভুবন সরকার সব বুঝেও মায়াকে উত্তর দিয়েছে— "পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।" ভুবন সরকার বয়সে বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু মনের সৌন্দর্য এখনো বর্তমান রয়ে গেছে। মায়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছে— "বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে করে রেখেছি।"

৩১০.২.৮.৬ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পটির বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

২। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পটির নামকরণের সার্থকতা কোথায়? নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

৩। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পটি যৌনতার নয়, সৌন্দর্যচেতনার — নিজের ভাষায় সংক্ষেপে আলোচনা করো।

৪। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প হিসেবে কতখানি সার্থক আলোচনা করো।

৫। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গিরগিটি গল্পে প্রকৃতি প্রসঙ্গ যেভাবে এসেছে তা আলোচনা করো।

৩১০.২.৮.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প— সম্পাদনা ও ভূমিকা— ড. নিতাই বসু।

২। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ— বীরেন্দ্র দত্ত।

৩। কালের পুত্তলিকা— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতি —প্রকৃতি — সোহারাব হোসেন।

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক - ৯

শহীদের মা

সমরেশ বসু

বিন্যাসক্রম

৩১০.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩১০.৩.৯.২ : ছোটগল্পকার সমরেশ বসু

৩১০.৩.৯.৩ : 'শহিদের মা' গল্পের পাঠ—বিশ্লেষণ

৩১০.৩.৯.৪ : তথ্যসূত্র

৩১০.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৩.৯.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.২.৯.১ : ভূমিকা

সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যে বহু আলোচিত একজন লেখক। পাঁচের দশকের অন্যান্য লেখকগণ যখন দেশভাগ, মধ্যবিত্তের সংকটকে তাঁদের লেখায় তুলে ধরছেন তখন সমরেশ বসু শ্রমজীবী বস্তিবাসী পথবাসী মানুষদের নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছিল একদল তরুণ গল্পকার তাঁদের লেখায় সমকাল প্রকাশ পাচ্ছিল। এঁদের পূর্বসূরী রুপে মহাশ্বেতা দেবী ও সমরেশ বসুর নাম করা যায়। তাঁর সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য এসেছে নানা ভাবে। জীবন নিয়ে তেমন কোন আদর্শকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। তাঁর মতে সাহিত্যের দায় জীবনের কাছে থাকা উচিত। জীবনের থেকে সাহিত্য বড় নয়। তাই তাঁর সাহিত্যে রক্তমাংসের নারী পুরুষদের ভীড় লক্ষ্য করা যায়। জীবনশিল্পী সমরেশ বসুর ছোটগল্পের মধ্যে আমরা খুঁজে পাবো জীবনের ধূলিকণা। জীবন যে স্থির চিত্র নয়, তা যে এক চলচ্চিত্র তাঁর ছোটগল্পগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে।

৩১০.৩.৯.২ : ছোটগল্পকার সমরেশ বসু

সমরেশ বসু বাংলা কথাসাহিত্যের একজন শক্তিমান লেখক। ১৯৪৬ সালে শারদীয় পরিচয় পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব' প্রকাশিত হয়। তিনি তিনশোর বেশি ছোটগল্প লিখেছেন। গল্প রচনার বিষয় বৈচিত্র্যে তিনি তাঁর পূর্বজদের থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র বলা যায়। সামাজিক নানা সমস্যার কথা, শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব, নীচু তলার মানুষদের জীবন তার গল্পে আমরা পাই। পাঁচের দশকের অধিকাংশ গল্পকার যখন দেশভাগের পটভূমিতে, মধ্যবিত্ত মানুষের সমস্যার রূপ নির্মাণে ব্যস্ত যখন কলকাতা শহরের নাগরিক জীবনের নানান চিত্র দেখা দিচ্ছে, সেই সময় শ্রমজীবী মানুষের জীবন, বস্তিবাসী, পথবাসী মানুষকে নিয়ে এলেন তাঁর গল্পে। 'গুণীন', 'ফটিচার', 'মহাযুদ্ধের পরে', 'পাড়ি' গল্পে নিম্নশ্রেণির মানুষ বিশেষ করে ভিক্ষুকদের জীবন যাপনকে তিনি গল্পে রূপদান করেছেন। এই সময় অন্য কোনও গল্পকার যা করেননি। ছয়ের দশকের 'শানা বাউরির কথকতা', 'শুভবিবাহ' ইত্যাদি গল্পেরও উল্লেখ করা যায়। সমরেশ বসু সেইসময়কার একজন ব্যতিক্রমী লেখক। তাঁর গল্পে নিম্নবিত্ত দরিদ্র অবাঙালি মানুষদের বিচিত্র কাজের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন 'উরাতীয়া' গল্পের লেভেল ক্রসিং এর গেট্ম্যান লাখপতি, ধামারি আর তাদের সঙ্গিনী উরাতিয়া, 'কিমলিস' গল্পের বিহার থেকে আগত বস্তিবাসী কুলিমজুরের দল, 'ফুলবর্ষিয়া' গল্পের রামবচন, শিউবচন আর ফুলবর্ষিয়া,পাড়ি গল্পের ভেড়া আর শুয়োর চরানো ঝাড়ুদার নারীপুরুষ এবং আরও অনেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের ধারণা বহির্ভূত জীবন মূল্যবোধ নিয়ে এই গল্পগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই সময় একাধিক শক্তিমান লেখক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র,সন্তোষকুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর, রমাপদ চৈধুরী, আশাপূর্ণা দেবী এঁরা এই পর্বের লেখক। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র শিল্পী। এঁদের মধ্যে সমরেশ বসু 'সর্বাগ্রগ্য' বলেছেন অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী। তাঁর মতে— ' তাঁকে ঘিরে প্রায়শই উত্থিত হত বিতর্ক' তিনি এমন একজন লেখক যিনি প্রথাসিদ্ধ প্রত্যাশাকে প্রশ্ন করতে জানতেন। তাঁর উপলব্ধিতে,সংশয়ের ক্ষেত্রেও যা সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে তাকে লেখায় অভিব্যক্ত করতে দ্বিধা করতেন না। ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হত। গড়ে উঠত দুই বা তার বেশি পক্ষ। ১৯৬৪ সালে ছোটগল্প নব নিরীক্ষা পত্রিকায় প্রকাশিত হল 'স্বীকারোক্তি' গল্প। ব্যক্তির বিদ্রোহ, পরিবারের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তা দেখানো হয়েছে এই গল্পে। ১৯৬৮ সালে বের হল 'প্রজাপতি'। এই উপন্যাসকে ঘিরে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 'বিবর' থেকে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, প্রজাপতিকে ঘিরে তা চরমে উঠল। অশ্লীলতার দায়ে মামলা করা হয়। পরে অবশ্য সে মামলা খারিজ হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু সব দিক দিয়েই একজন ব্যতিক্রমী লেখক। স্রোতের বিপরীতে যিনি সর্বদা পাড়ি দিয়েছেন। সাহিত্যের যা কিছু দায় সে তো জীবনের কাছে, তাই তাঁর লেখায় জীবন ও সাহিত্য এক হয়ে গিয়েছে। ব্যক্তি জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার পটভূমিকায় বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি- প্রবৃত্তিকে গল্পে তুলে ধরেছেন। এত বিচিত্র ধরনের বিষয়বস্তু ও মানুষকে নিয়ে গল্প কম গল্পকার লিখেছেন। তাঁর লেখায় একঘেঁয়েমি নেই। তাঁর ছোটগল্প একই সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রাম, মনস্তত্ত্ব, যৌনতা,বিচিত্র জীবন যন্ত্রণা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে রাজনীতি ও সমাজনীতি। তিনি জীবনবাদী জীবনশিল্পী। তাঁর ছোটগল্পে জীবনের বহুমুখী প্রতিফলন দেখা

যায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প সংকলন হল — 'আদি মধ্য অন্ত', 'জোয়ার ভাঁটা',' অন্ধকারের গান', 'কীর্তিনাশিনী', 'মাসের প্রথম রবিবার', 'ছায়াচারিণী', 'মানুষ', 'বিদ্যুল্লতা', 'কামনাবাসনা', 'ও আপনার কাছে গেছে', 'ষষ্ঠ ঋতু', 'ছেঁড়াতমসুক', 'উজান', 'মনোমুকুর', ইত্যাদি। সমরেশ বসু সম্পর্কে সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত বলেছেন-

> 'He had the sensibility of Bibhutibhusan– the experience of Tarasankar— questioning is olated background that made Satinath Bhaduri different'.

মন্তব্যটি যথার্থ। বিচিত্র জীবন— অভিজ্ঞতা এবং জীবন —পিপাসা যথার্থ ভাষারূপ পেয়েছে তার ছোটগল্পে।

৩১০.৩.৯.৩ : 'শহিদের মা' গল্পের পাঠ—বিশ্লেষণ

বিমলা তার সমস্ত শরীর জুড়ে বাদলকে অনুভব করে। আজ বাদলের জন্মদিন। বিমলা ছাড়া আজকের দিনের কথা কেউ মনে রাখেনি। বিমলাকে মনে রাখতে হয় কারণ সে বাদলের মা। বিমলার বয়স হলেও দেখে তা মনে হয় না। পৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়েসে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন' রান্না ঘরের পেছনের দিকে ঘর যেখানে শেষ হয়েছে তার কোণে জবা ফুলের গাছ বিমলা সেখানে দাঁড়ালেন। সামনে কলোনির রাস্তা দেখা যায়। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেখানে দেখলেন।সেইখানে শহিদ বেদি হয়েছিল। এখন আর বেদিটা নেই কয়েকটা ইঁট পড়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে বিমলা আপন মনে মাথা নাড়ে আর ভাবে—

'বাদল ওখানে নেই' তিন মাস আগে বেদিটা তৈরী হয়েছিল। বাদলের মা রাতারাতি 'শহিদের মা' হয়ে যায়। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসেছিল বিমলাকে ডাকতে, বাড়ির আর কাউকে মানে বাদলের দুই দাদা আর বাবাকে ডাকা হয়নি। বাদলের দুই দাদা ও বাবা আলাদা পার্টি করে তাই তাদের ডাকা হয়নি। পার্টি করতে গিয়ে ছেলে খুন হয়েছে তাই বিমলা আজ 'শহিদের মা'। বিমলা সেদিন কেন ঐখানে গিয়েছিল কে জানে। আঠারো বছরের বাদলকে কারা পিটিয়ে মেরেছিল? কেন মেরেছিল? তা কেউ জানে না। বাদলের নিথর দেহটাকে উঠানে নিয়ে আসা হলে বিমলা কেঁদে উঠেছিল। আপন মনে বলে উঠেছিল — 'কে তোকে এমন করে মারল বাদল'। কিছুক্ষণ পরে ফুল মালায় সাজিয়ে বাদলকে শ্লোগান দিতে দিতে নিয়ে গিয়েছিল- 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন। 'এর দুদিন পরে বেদিটা তৈরী করা হয়েছিল। বাদলের পার্টির সভা নয়, অন্যকোন দলের সভা সেখানে কী একটা গোলমাল হয়েছিল কেউ সঠিক কিছু বলতে পারেনি। বাদলকে কেন ওরা মারল? বাদলের পার্টির লোকেরা যাদের নাম পুলিশকে বলেছিল তারা সবাই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে অথচ ব্যাপারটা কিছুই না। দুদিন পরে শহিদ বেদিটা তৈরী হয়েছিল। দুদিনে ছোটোখাটো সংঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘরকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

কেন তা বিমলা জানে না। বিমলা সেদিন কেন শহিদবেদির কাছে গিয়েছিল তাও তার অজানা। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা শ্লোগান দিয়েছিল— 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'। বাদলকে নিয়ে একটি ছেলে কিছু বক্তৃতা দেয়। সেই বক্তব্যের কিছুই বিমলার কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বিমলা আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে বিমলা রান্না ঘরে চলে যায়। কৃপাল,দয়াল,হরপ্রসাদ কারো সঙ্গে একটিও কথা বলে না। হরপ্রসাদ রান্না ঘরের দরজার সামনে এসে আপন মনে বলেছিল-' কতদিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো'। বিমলার কোন জবাব না পেয়ে হরপ্রসাদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল— 'এখনকার এসব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল তার গেল,কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না। 'সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কৃপাল চাকরি করে, দয়াল বেকার। ওরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে তিন জন কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। 'গামছা, তেল, সাবান, চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে, দলের কথা একেবারেই বলে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে, না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোন ও কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরেনি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনও কথাই নেই।'

বাদলের মৃত্যুর পর বাড়ির সবার কাছে বাদল অতীত। তাকে নিয়ে কেউ কোন কথা বলে না। অন্য দলের ছেলে হয়েই থেকে যায়।বাড়ির সবার কাছে বাদল ফুরিয়ে গেছে,হারিয়ে গেছে। কিন্তু বিমলার কাছে প্রবলাবে আজও আছে। 'আজ উনিশে শ্রাবণ' অতীতে আঠারো বছর আগে ফিরে যায় বিমলা। বাদলের আজ জন্মদিন কেউ মনে রাখেনি। এই দিন এই সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। বাদলের ভূমিষ্ঠ হবার দিন। আঠারো বছরের তরতাজা যুবক বাদলকে হারিয়ে বিমলা বাদলের জন্ম মুহূর্তকে অনুভব করে। দুই ছেলের পর একটি মেয়ের আশা করেছিল বিমলা-হরপ্রসাদ। কিন্তু আবারও পুত্রসন্তান। বাদলের পরে বিমলার আরও দুই ছেলে হয়েছিল। কিন্তু অল্প বয়েসে তারা চলে গিয়েছে। তাই বাদলই বিমলার ছোট ছেলে। সেই বাদল আজ কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পনের সময় তার মৃত্যু। আঠারো বছর আগে বাদলের জন্মের সময় যা যা ঘটেছিল আজ সব মনে পড়ে যায় বিমলার।

আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে ব ে স , চোখ বুজলে, বিমলা বিমলা চমকে চমকে উঠেছেন। পেটের মধ্যে কিছু যেন নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবা গাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহিদ বেদির দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ; আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রুণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তার গর্ভের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে। তিনি মনে মনে ডাকলেন, বাদল, বাদল। ১

মায়ের মনে সন্তান চিরকাল বেঁচে থাকে। বাড়ির সবার কাছে বাদল মৃত। কিন্তু বিমলা তার সমগ্র শরীর দিয়ে বাদলকে অনুভব করে। বাদলের জন্ম মুহূর্তকে মনে করার মধ্যদিয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের প্রবল

নাড়ীছেঁড়া ভালোবাসার বন্ধনকে দেখানো হয়েছে। আজকের সময়কে ভুলে গিয়ে বিমলা প্রবেশ করেছে আঠারো বছর আগের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে। বাস্তবের মাটিতে ফিরে আসেন কৃপালের ডাকে। কিন্তু বিমলা আজকে কারো ডাকে সাড়া দিতে চাইছে না।

তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি ভাঙা শহিদ বেদির দিকে। ২

সমগ্র সত্তা দিয়ে বিমলা বাদলের জন্মক্ষণে ফিরে গিয়েছে। ছেলেদের ডাকে সাড়া দিতে ভুল হয়না বিমলার। কিন্তু আজ সে সাড়া দেবে না।

আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না। ৩

আজ বিমলা আঠারো বছর আগের দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইছে। আজকের এই দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে তিনি মুক্তি চাইছেন।বিমলা ফিরে যেতে চায় অতীতে, যেখানে তিন ভাইকে এক সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন।বাদল সবার থেকে ছোট ছিল বলে দুই দাদার কোলে কোলে বড়ো হয়েছে। ছোট ভাইকে না দিয়ে তারা কিছু মুখে তুলত না। দুই দাদার আদরে বাদল বড়ো হতে লাগল। বড়ো হবার সাথে সাথে সম্পর্কের বাঁধন আলগা হতে লাগল। কৃপাল,দয়াল কলেজে ঢুকে রাজনীতি করতে শুরু করল। হরপ্রসাদ এতে বিরক্ত হয়। চার জন চারটি দলের হয়ে নাম লেখায়। মতাদর্শে প্রত্যেকে আলাদা হয়ে পড়ায় সম্পর্কগুলোর বন্ধন আলগা হতে থাকে। পারিবারিক সম্পর্কের মাঝে রাজনীতি প্রবেশ করায় নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরী হয়। সুখী গৃহকোণে অবিশ্বাস আর সন্দেহ প্রবেশ করে। বিমলা এত কিছু বুঝে উঠতে পারে না। তার মনে হয়—

সবাই মিলে একটা দল করলেই ই তো সব মিটে যায়। ৪

বিমলার সহজ কথার সহজ উত্তর কেউ দিতে পারে না। অন্য দলের ছেলে মারা গিয়েছে বলে নিজের বাবা, দাদারা কেউ মৃতদেহ কাঁধে নেয় নি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। বিমলা সেদিন উপলব্ধি করেছিল —

> পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। ৫

বিমলা এতদিন সব সহ্য করেছে। সংসারটাকে একা হাতে সামলে রেখেছেন। আজ তিনি এসব দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চান। তার মনে হতে থাকে পার্টিই যদি সব হয়ে থাকে যেখানে স্নেহ, মায়া মমতার কোন মূল্য না থাকে তাহলে এ সংসারের জন্য কিছু আর করবেন না।

> বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহিদ বেদি থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।৬

বিমলা শুনতে পান কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদ সবাই তাকে ডাকছে। কেউ কারো সাথে কথা বলে না অথচ সবাই তাকে ডাকছে। আজ সবার বিরুদ্ধে বিমলা জেহাদ ঘোষণা করেছে। বিমলা শহিদ বেদির

দিকে তাকিয়ে থাকে। তিন মাস যেতে না যেতেই শহিদ বেদিটা ভেঙে পড়েছে। যারা গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিল যারা শহিদ বেদিতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তারা আর কোনদিন আসেনি বিমলার খোঁজ নিতে। সন্তানকে হারিয়ে একজন মা কেমন থাকে সে খবর কেউ রাখেনি। কৃপাল দয়ালের কাছে তাদের মা শুধু রান্না করবে, সংসার সামলাবে, খেতে দেবে তার বাইরে আর কোনও কাজ নেই। মায়ের মনের খবর কে রাখে। আঠারো বছর আগে এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে।

> বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহিদবেদিতে না। তাঁর বুকেই আছে। ৭

আজ বাদলের জন্মদিন।বাবা হরপ্রসাদ, দুই দাদা কৃপাল-দয়ালের মনে নেই। বিমলা জানেন এসব তুচ্ছ বিষয় তাদের কারো মনে থাকে না। বিমলা তার তিন ছেলের জন্মদিনে পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল এসব করেছেন। গতবছর বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন।

> বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না। ৮

আজ বিমলা পরিবারের কারও জন্য রান্না করেননি। হরপ্রসাদ বিমলার এই আচরণের কারণ বুঝতে পারে না। তাই বলে—

> রান্না বান্না কিছু করনি। আধ কাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে গেছে।
> কী ব্যাপার তোমার? ৯

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না বিমলা। বাদলের স্মৃতি মন জুড়ে খেলে বেড়ায়।

> শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে।দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে।সন্তান শুধু বিমলার। ১০

একজন সন্তানের মূল্য মায়ের কাছে কতখানি তা এ গল্পে দেখানো হয়েছে। পরিবারের সবার আলাদা আলাদা মতাদর্শ ছিল। কিন্তু মৃত ভাই ও সন্তানের জন্য বাবা, দাদাদের কোনো বেদনা ছিল না। মাত্র আঠারো বছর বয়েসে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে বাদলকে। যারা শহিদ বেদি নির্মাণ করেছিল তারাও কি মনে রেখেছে বাদলকে? রাখেনি, তিন মাসের মধ্যে শহিদ বেদি গুঁড়িয়ে গেছে। শহিদের মা কেমন আছে তা কেউ খোঁজ রাখেনি। তাই বিমলা আজ সারাদিন বাদলের স্মৃতিচারণ করছেন।

> আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন।বাদল এখন তাঁর বুকে। ১১

সংসারের মানুষগুলোর স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতায় বিমলা বিমূঢ় হয়ে যায়। আজ সে কোন প্রয়োজনের দাবি মেটাবে না। দৃপ্ত স্ট্রে সে কথা সে জানিয়ে দেয়। রাজনীতি আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কীভাবে সম্পর্কগুলো ভেঙে দিয়েছে, আমাদের কীভাবে নীতিহীন আদর্শহীন করে তুলছে তা তুলে ধরা হয়েছে।

সাতের দশকের রাজনীতি, হত্যা, বিশ্বাসহীনতাকে তুলে ধরা হয়েছে। সবাইকে সবাই সন্দেহ করছে। বিমলার শেষ বক্তব্য তাই ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে।

তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না। ১২

বিমলার এমন আচরণে তিন জন বিস্ময় প্রকাশ করে। তিন জনের চোখের দৃষ্টি পালটে যায়। তারা তাদের মাকে চিনতে পারছে না। স্বামী তার স্ত্রীকে বুঝতে পারছেন না।

বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। ১৩

এই প্রথম বিমলাকে তাদের ভয় করতে শুরু করল। যে এতদিন সংসারের সব দাবিকে পূরণ করে এসেছে নীরবে তার এমন দৃপ্ত সোচ্চারে বলা কথা - 'আমাকে ডাকিস না' বলা কথাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। ধীরে ধীরে তিন জন চলে যায়। বৃষ্টির মধ্যে বিমলা দাঁড়িয়ে থাকে। এতদিনের অভিমান গলা দিয়ে দলা পাকিয়ে নেমে আসতে থাকে। বৃষ্টির জলের ধারায় গাল ধুয়ে যাচ্ছে।বুকের কাছে হাত রেখে—

মনে মনে ডাকলেন, বাদল বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস।
আমার কাছে থাক ১৪

মায়ের কাছে সন্তান চিরকাল বেঁচে থাকে। রাজনীতি নয় এ গল্প একজন সন্তানহারা মায়ের গল্প হয়ে উঠেছে। গল্প জুড়ে বিমলা আর শহিদ বাদলের উপস্থিতি। শহিদের মা নামকরণটি ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে।

৩১০.৩.৯.৪ : তথ্যসূত্র

১। সমরেশ বসু রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০০৮, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.৬৯৫

২। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৫

৩। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৫

৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৬

৫। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৭

৬। পূর্বোক্ত, পৃ.৬৯৭

৭। পূর্বক্ত, পৃ.৭০১

৮। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০১

৯। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০১

১০। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০১

১১। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০২

১২। পূর্বক্ত, পৃ.৭০২

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০২

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ.৭০২

৩১০.৩.৯.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'শহিদের মা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করুন।

২। 'শহিদের মা' গল্পের বিমলা চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করুন।

৩। 'পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়'— গল্প অবলম্বনে উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

৪। 'বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহিদ বেদি থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান'।— বিমলার এই ভাবান্তরের কারণ গল্প অবলম্বনে আলোচনা করুন।

৫। কোন সময়ের রাজনীতির প্রসঙ্গ শহিদের মা গল্পে চিত্রিত হয়েছে আলোচনা করুন।

৬। 'শহিদের মা' গল্পের গঠনশৈলী আলোচনা করুন।

৭। 'শহিদের মা 'গল্পের প্রধান চরিত্র ও অপ্রধান চরিত্র।

৩১০.৩.৯.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়,কালের পুত্তলিকা, দেজ পাবলিশার্স

২। সুবল সামন্ত সম্পাদিত বাংলা গল্প ও গল্পকার, এবং মুশায়েরা

৩। সুমিতা চক্রবর্তী ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি

৪। শ্রাবণী পাল সম্পাদিত, বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক, পুস্তক বিপণি

পত্রিকা

১। এবং জলার্ক, সমরেশ বসু সংখ্যা ২, অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৯৯

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক - ১০

জননী

বিমল কর

বিন্যাসক্রম

৩১০.৩.১০.১ : জননী (বিমল কর)

৩১০.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.৩.১০.১ : জননী (বিমল কর)

গল্পটি লেখকের অন্যতম প্রিয় গল্প বলে জানিয়েছেন তিনি। চাকরিসূত্রে বিহারের কোনো সাঁওতাল-পল্লীতে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে তিনি একটি কুটিরের দেওয়ালে একটি ছবি চিত্রিত দেখেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঐ পরিবারে একটি ছোটো ছেলে অকালে মারা যায়। মৃত্যুর পর ইহলোক ছেড়ে পরলোকের যাত্রাপথ একাকী অতিক্রম করতে হবে ছেলেটিকে। সেই যাওয়াটুকু যাতে সহজ ও সুগম হয় তারই জন্য নিজেদের ইচ্ছা ও কল্পনা দিয়ে ছবিটি এঁকে রেখেছে ঐ অকালমৃতের প্রিয়জনেরা। গাধা কিম্বা ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছে বাচ্চা ছেলেটি, তার হাতের লাঠিটা কাঁধে, যার একপ্রান্তে বাঁধা রয়েছে হয়তো বা চিঁড়ে-গুড়ের পুটলি, অন্য প্রান্তে এক ঘটি জল। এই অন্তিম যাত্রাপথের পাথেয় সম্পর্কে চিন্তাটি লেখককে একই সঙ্গে বিষণ্ণ ও মুগ্ধ করে তুলেছে। ভাবিয়েছে অনেকদিন। তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত। ক্রমে শিল্পীমন যেভাবে এই প্রতীতিটিকে (impression) শিল্পরূপ দিলেন, তা-ই হয়ে উঠল একটি পূর্ণায়ত ছোটোগল্প-জননী।

যদিও সাধারণভাবে ছোটোগল্পে ভূমিকাপর্ব অগ্রহণীয়, তবুও 'জননী' তে একটু ভূমিকাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা জানতে পারি মফঃস্বল শহরে এক বিঘের ওপর দোতলা বাড়ি ও পাঁচ বিঘের পাঁচিলঘেরা বাগান সমেত আবাসে অবস্থাপন্ন পরিবারটি দীর্ঘকালের বসবাস। প্রথম পুত্রের পর প্রথম কন্যা, তারপর দ্বিতীয় পুত্র, দ্বিতীয় কন্যা এবং পঞ্চম সন্তান কনিষ্ঠ বা ছোটো ছেলে 'কড়ে' কে নিয়ে একটি ভরাট সংসার। এই কনিষ্ঠ পুত্রের জবানীতে গল্পটি উপস্থাপিত। কথকের বলা

ভূমিকায় পরিবারটির ওপরে নেমে আসা বেশ কয়েকটি দুর্বিপাকের কথা অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত হয়েছে।

বড় মেয়ে অনুপমা অসামান্যা রূপ থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারেনি। দুশ্চরিত্র স্বামীকে ত্যাগ করে সে একলা চলে এসেছে পিতৃগৃহে, আর ফিরে যায়নি। দ্বিতীয় পুত্র দীনেন্দ্র এক ট্রেন যাত্রায় আচম্‌কা দুর্ঘটনায় দুচোখ হারিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ। আকস্মিকভাবে সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হয়েছে পরিবারের কর্তা—বাবার। ছোটো মেয়েটি চঞ্চল ছটফটে স্বভাবের। স্বেচ্ছায় সে নানা সেবামূলক কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে অকালে স্বাস্থ্য হারিয়ে শয্যা নিয়েছে। এও পরিবারের স্বজনদের কাছে বেদনাবহ। আর সবশেষে যে শোকের ঘটনার কথা আমরা জেনেছি, সেই সাম্প্রতিক আঘাত হল মায়ের মৃত্যু—"এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মা-র মাথার চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়ানো সরের মত কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখ নিয়ে মা বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।"

এই মৃত্যুই গল্পের সূচনাবিন্দু—স্টার্টিং পয়েন্ট। মায়ের দেহ বারোয়ারী শ্মশানে না নিয়ে তাঁর সন্তানেরা বাগানের এক প্রান্তে দাহ করেছে। সেই জায়গায় শ্বেতপাথরের বেদী তৈরী করে সেখানে ধূপ-দীপ জ্বেলে মায়ের পাঁচটি সন্তান সমবেত স্মৃতিতর্পণের জন্য বসেছে। চৈত্রের বাতাস, অকলুষ চন্দ্রিমা, শোকশুদ্ধ আত্মাপঞ্চক আর বেদির মাথার কাছে এদের বাবার হাতের কদম গাছ — এই প্রেক্ষিত ও আবহে মায়ের দ্বিতীয় পুত্র মাতৃতর্পণের এক অভিনব প্রস্তাব রাখল। সকলে তাতে সম্মত হল, মনস্থির করল — "এ সংসারে মা কী পায় নি, কী অভাব তার ছিল, কী পেলে মা-র সে অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মা-র এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধহয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারিনি।"

এর পরে প্রতিটি সন্তানের নিজস্ব চেতনে মায়ের যে ছবি ও ভূমিকা ধরা আছে তার নিরিখে একাগ্র হয়ে উঠল তাদের আপন-আপন সন্ধান। বড়ো ছেলেকে দিয়ে শুরু হল এই স্মৃতিতর্পণ। ভাইবোনেদের অনুনয়ে সে নিজের হৃদয়ে লুকানো মায়ের অপূর্ণতার ছবিখানি মেলে ধরেছে। বিবাহযোগ্য ছেলের জন্য অপূর্ব সুন্দরী কনককে মা পছন্দ করে রেখেছিল। কিন্তু ছেলেই এই বিয়ে ঘটতে দিল না। কারণ সে জানত যে তারই বন্ধু অবনী ও কনকের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক ভেঙে তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে চায়নি সে। হয়তো কনককে মনে মনে ভালোও বেসেছিল—কিন্তু তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মত্যাগের ঔদার্য দিয়ে সে পেরেছিল নিজেকে সরিয়ে নিতে। এই সিদ্ধান্তে মা অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিল। কষ্টও পেয়েছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু মায়ের মনটি যদি তার বড়ো ছেলের মত উদার হত, যদি মা ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে তাদের মন নিয়ে উপলব্ধি করতে পারত, তাহলে তার এই বেদনা নিয়ে তাকে ইহলোক ত্যাগ করে যেতে হত না। মায়ের বড়ো ছেলে মাকে হৃদয়ের ভালোবাসা তথা আত্মত্যাগ উৎসর্গ করল পরলোকের পাথেয় রূপে।

দ্বিতীয় সন্তান বড়ো মেয়ে অনুপমা। অনুপমার জীবনে এক অপ্রত্যাশিত ট্র্যাজেডি নেমে এসেছে। তার দুর্ভাগ্যের বোঝা চিরকাল অন্তহীন তাকে বয়ে চলতে হবে—এই প্রচলিত সমাজ সংসারের রায়। আজ স্মৃতিতর্পণে বসে এই ভাগ্যনিপীড়িতা সহোদরার মুখ থেকে তার একান্ত ব্যক্তিগত আরও তথ্য পেল তার

ভাইবোনেরা। মা নাকি বড়ো মেয়ের স্বামীকে ছেড়ে চলে আসা ভালো মনে মেনে নিতে পারেনি। নানাভাবে, শুধু স্বামী বলেই তার কাছে ফিরে যাবার জন্য মেয়েকে বকাঝকা এবং জোর করত মা। কিন্তু তার বদলে মায়ের যা করা উচিত ছিল বলে অনুপমা ভেবেছে তা হল—সাহস করে তথাকথিত পারিবারিক মর্যাদা ও সমাজপ্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে মেয়েকে দ্বিতীয়বার সৎপাত্রস্থ করা। কেননা—'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।' শুধুমাত্র মায়ের সাহসের অভাবেই তার একটি সন্তানের জীবন অন্ধকার হয়ে রইল। এই ব্যর্থতা কি মায়ের চরিত্রের এক শোচনীয় অপূর্ণতা নয়? এই অপূর্ণতাকে মুছিয়ে দিতে হলে যা দরকার তা উচিত সাহস। মায়ের জন্য অঞ্জলিতে তার বড়ো মেয়ে এই 'উচিত সাহস' সাজিয়ে দিয়েছে।

পরের পালা ছোটো মেয়ে নিরুপমার। অসুস্থ অবিবাহিতা মেয়েটি স্বভাবচঞ্চল বলেই হয়ত মনস্থির করতে একটু সময় নিয়েছে। তারপর খানিকটা অগোছালোভাবেই কথা শুরু করেছে। রোগশয্যায় শুয়ে সে যখন নিঃসঙ্গ ও হতাশ্বাস, তখন তাকে তার বন্ধুরা সঙ্গ দেবার জন্য আসত। "বেশী আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত, এ অসুখ কিছুই না। ..... মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়। ..... একদিন মা আমার সামনে সুশান্তকে বলল, তুমি তো ডাক্তার নও; কেন অযথা ওসব কথা বল। ওকে বকিও না, বিরক্ত করো না। .... সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না।" নিরুপমার অসুখের মধ্যেও সুখের সংকেত এসেছিল, ডাক্তারিশাস্ত্রে যে নিদান নেই সেই নিদানের সন্ধান এনেছিল সুশান্ত। নিরুপমার মনে আশ্বাস ও ভরসা দিতে তার এই যে নিয়মিত রোগীর কাছে আসা, তাকে ভালো মনে নিতে পারেনি তার মা। সুশান্তর উপস্থিতি মায়ের কাছে মূল্যহীন ছিল বলেই নিরুপমার সুস্থ জীবনের সব ভরসা শেষ হয়ে গেছে। তাই, নিজের উপলব্ধি থেকে তার মনে হয়েছে মায়ের অসম্পূর্ণতা তার মতো করে সে খানিকটা পূরণ করে দিতে পারবে যদি সে 'ভরসা' করার শক্তি মায়ের পরবর্তী চলার পথে যুক্ত করে দেয়।

এরপর বলার জন্য তৈরী হয়ে নিল ছোটো ছেলে — এই গল্পের উত্তমপুরুষ - কথক। তার বলবার কথা, মাকে দেবার জন্য সে মনের কোন্ জিনিসটিকে তুলে আনবে। মায়ের শেষ সন্তান বলে সংসারের পরতে পরতে ঘিরে থাকা মাকে সে দেখতে পায়নি তার অন্যান্য দাদা-দিদিদের মত করে। ব্যক্তিগত একান্ত কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতায় জড়িয়ে না থাকলেও মাকে সে একটা সুযোগে খুব কাছে থেকে চিনেছে। বাবার মৃত্যুর পর এই অনভিজ্ঞ ছোটো ছেলেটিকে সঙ্গী করে মায়ের বেনারস-যাত্রার মূল উদ্দেশ্য যে স্বামীশোকসন্তপ্ত মহিলাটির মন জুড়ানো নয় তা ততদিন বড় হয়ে ওঠা ছোটোছেলেও বুঝে ফেলেছিল। বহুকাল আগে বাবার সঙ্গে এক অংশীদারী ব্যবসার অংশীদার শচীনজ্যাঠা তখন কাশীতে। দুঃখ-দুর্ভাগ্যে-দারিদ্র্যে তখন শচীনজ্যাঠা সপরিবার সেখানকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় গলা পর্যন্ত ডুবে। মা এতই হিসেবী ছিল, মাত্র দুশো টাকা ধরিয়ে দিয়ে ঐ যুগ্ম ব্যবসার অংশীদারীত্ব থেকে শচীনজ্যাঠার স্বত্ত্ব বাতিল করিয়ে নিল। ছেলে এতে আপত্তি জানালে মা কঠোরভাবে তা খারিজ করে — "অত স্বার্থত্যাগ আমি শিখি নি।" মায়ের দীনতা, কৃপণতার পরিচয় পেয়ে মর্মাহত হয়ে রয়েছে তার কনিষ্ঠ সন্তান। তাই আজ জননীর পথের পাথেয় হিসেবে সে বলে — "আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব।"

সৎকারে একজন সন্তানের কৃত্য এখনও বাকি। সে তৃতীয় সন্তান, দ্বিতীয় পুত্র দীনু। দীনেন্দ্রর নিয়তি অন্ধত্বের অভিশাপ বয়ে এনেছে তার জীবনে। প্রত্যক্ষভাবে কর্মজীবন বা সংসার জীবনে সে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু তার অন্তর্জীবনটুকুর মধ্যে সে অত্যন্ত গভীর করে জীবনকে উপলব্ধি করেছিল। অন্তরের নিখাদ উপলব্ধি দিয়ে মাকে সে সঠিকভাবে বুঝে নিয়েছিল। সাংসারিক ঝড়-বাদল, বিষয়-আশয়ের কূটকচালি কীভাবে মাকে গ্রাস করে তার স্বচ্ছদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, তা দৃষ্টিহীন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিবান দীনেন্দ্র জানতো। তাই দীনুর মাতৃঅর্ঘ্য—"আমাকে যেমন একটা নির্বোধ স্যুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল। মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম। .... এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।"

'জননী' গল্পটির মূল কাঠামো আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে আসলে জীবন-পর্বে হওয়া বা হয়ে ওঠার কিম্বা হয়ে উঠতে না পারার একটি প্রতীকী গল্প 'জননী'। লেখকের একটি সাঁওতাল পল্লীর ছবি দেখার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি কল্পনার স্তর বেয়ে এক দার্শনিক চেতনালোকে নিয়ে গেছেন পাঠককে। সেদিক থেকে দার্শনিক গল্পও বলা যায় 'জননী'কে।

লেখকের স্বকীয় ভাবজগৎ এবং মননের বিশিষ্ট ভঙ্গি জননী গল্পে প্রতিফলিত। মানুষের অন্তর্নিহিত তীব্র অসহায় যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে গেছেন তার উত্তরণের ঠিকানাতে। এই পথ চলতে বিমল কর কখনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। উপন্যাস রচনার দক্ষ কারিগর ভুলে যাননি ক্ষণেকের জন্যও যে তিনি ছোটোগল্প লিখতে বসেছেন। উদাহরণত বলা যায়, বড় মেয়ে অনুপমার ব্যর্থ বিবাহোত্তর জীবনে হয়তো প্রেম এসেছিল —এই বিষয়টি পল্লবিত হলে তা উপন্যাসের শাখাকাহিনী হতে পারত। কিন্তু মাতৃস্মৃতিতে একাগ্র সন্তানদের সৎকার এখানে মূল বিষয়। তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটুকুর বাইরে লেখক একটি শব্দও গ্রহণ করেননি। এভাবেই প্রতিটি সন্তানের জীবনানুষঙ্গ উপলক্ষ্য হয়ে এসেছে, লক্ষ্য নয়।

'জননী'-গল্পের মহামুহূর্তটি ঘনিয়েছে দীনেন্দ্রর মাকে তার অন্তশ্চক্ষু দানের সঙ্গে সঙ্গেই। সব ছেলেমেয়ের তর্পণের উপসংহার যেন রচিত হয়েছে। সদ্যোমৃতা মায়ের অন্তিম সৎকার এভাবেই শেষ হয়েছে।

যদিও একটি সম্পর্ক-সংকেতে গল্পের নামকরণ, কিন্তু গল্পটি চরিত্রমুখ্য নয়, ভাবমুখ্য। আমাদের পার্থিব জীবনে পরমায়ুকাল সমাপ্ত করে প্রত্যেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই। এই জীবনে আমাদের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতাগুলি সম্পর্কে আমরা নিজেরা প্রায়শই সচেতন থাকি না। অথচ আমাদের একান্ত আপনজনেদের বিচারে তা ধরা পড়ে। সেই নিরীখটি থেকেই মায়ের সন্তানেরা তাদের আটপৌরে মাকে এক নির্দোষ পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জননীরূপে পরলোকের পথে এগিয়ে দিতে চেয়েছে। যেন এক বৃত্তাকার সুসম্পূর্ণ জীবনমালিকায় গেঁথে দিয়েছে এক একটি পবিত্র পুষ্প। মা তখন হয়ে উঠেছেন জননী, মহিমময়ী। এই ভাবনা থেকেই গল্পটির নামকরণ।

৩১০.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'জননী' গল্পটিতে লেখকের জীবনদর্শন কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনার দ্বারা ব্যক্তি করো।

২। পাঁচ সন্তান তাদের আত্ম অনুসন্ধানের আলোয় কীভাবে ও কেন মৃত জননীকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছে, 'জননী' গল্প অবলম্বনে তা বুঝিয়ে দাও।

৩। বিমল করের 'জননী' গল্পটিতে ভিতরের দৃষ্টি বলতে কী বোঝানো হয়েছে–আলোচনা করো। আপাতদৃষ্টিতে মধ্যবিত্ত জননীর কার্যকলাপ অমানবিক হলেও শেষপর্যন্ত তা অন্য একটি দৃষ্টিকোণ খুঁজে পায়–কীভাবে?

৩১০.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার — ভূদেব চৌধুরী

২। বাংলা ছোটগল্প — শিশিরকুমার দাশ

৩। ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — বীরেন্দ্র দত্ত

৪। সাহিত্যে ছোটোগল্প — নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক - ১১

শবাগার

মতি নন্দী

বিন্যাসক্রম

৩১০.৩.১১.১ : লেখক পরিচিতি

৩১০.৩.১১.২ : গল্পের ভাববস্তু, গল্পের নামকরণ এবং মৃত্যুপ্রসঙ্গ

৩১০.৩.১১.৩ : রচনাকৌশল

৩১০.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.৩.১১.১ : লেখক পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মতি নন্দী(১০ জুলাই ১৯৩১ - ৩ জানুয়ারি ২০১০)স্বতন্ত্র ধারার লেখক। ক্রীড়া জগতের সাংবাদিক হয়েও সাহিত্যে বিশ্বসংসারের সংবাদ যেভাবে, যে দৃষ্টিতে পরিবেশন করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। তিনি উত্তর কলকাতার ২৫ নং তারক চ্যাটার্জি লেনের বাসিন্দা। তাঁর প্রতিবেশী কিংবদন্তী ফুটবলার গোষ্ঠ পাল, ইংলিশ চ্যানেল জয়ী আরতি গুপ্ত (সাহা), সংগীত শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিমান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁর স্বপ্ন ছিল বন্ধু মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নাটক লিখে তার চিত্রনাট্য নির্মাণ করা, চলচ্চিত্র পরিচালনা করা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভারতের এবং বিশ্বের নানা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অভিঘাত প্রতিমুহূর্তে তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি আজীবন সত্যকেই সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখেছেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলতেন, মতি নন্দী লেখকদের লেখক। সন্তোষকুমার ঘোষ বলতেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরী। আবার কারো মতে তিনি নিছক ক্রীড়া সাংবাদিক। অবশ্য এসব নিন্দা-প্রশংসা তিনি একেবারেই আমল দিতেন না। তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবন ও পরিপার্শ থেকে লেখার উপাদান খুঁজেছেন।

মতি নন্দীর লেখা প্রথম গল্প 'ছাদ'। প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে 'দেশ' ডিসেম্বর সংখ্যায়। ঐ বছরে প্রকাশিত হয় 'চোরা ঢেউ' 'পরিচয়' পত্রিকায়। ১৯৫৮ সালে 'শারদীয়া পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বেহুলার ভেলা' তাঁকে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হয় — 'রাস্তা', 'একধরনের অসুখ', 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান', 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু', 'শবাগার', 'একটি মহাদেশের জন্য', 'কপিল নাচছে', 'জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ', 'রেড্ডি', 'অবিনাশের সাড়ে আটচল্লিশ', 'আত্মভূক'-এর মতো ছোটগল্প। ছোটদের জন্য লিখেছেন— 'কোনি', 'অলৌকিক দিলু', 'স্টপার', 'স্ট্রাইকার', 'ফেরারি', 'ক্রিকেটের আইন কানুন', 'বিশ্বজোড়া বিশ্বকাপ' ইত্যাদি উপন্যাস, 'কলাবতী' সিরিজের উপন্যাস, 'নক্ষত্রের রাত', 'সাদা খাম', 'সহদেবের তাজমহল', 'পূবের জানালা' ইত্যাদি উপন্যাস তাঁর সৃষ্টিকর্মের পরিচায়ক। 'সাদা খাম' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান, ১৯৯১ সালে, ১৯৭৪ সালে পান আনন্দ পুরস্কার। শিশু কিশোর সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পান বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, শরৎ স্মৃতি পুরস্কারেও তিনি সম্মানিত হন। 'উল্টোরথ' পত্রিকায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি উপন্যাস' প্রতিযোগিতায় প্রথম হয় তাঁর 'ধূলোবালির মাটি'উপন্যাসটি। তাঁর লেখা গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়ে গৌরব অর্জন করেছে।

নিজের চারপাশের সমাজ থেকে তিনি পরম মমতায় গল্পের উপাদান কুড়িয়েছেন। তাঁর অনেক লেখাতেই মৃত্যু এসেছে প্রবলভাবে। 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু', 'একটি মহাদেশের জন্য', 'শবাগার' ইত্যাদি গল্পে মৃত্যু ছায়া ফেলেছে। চারপাশের বীভৎস খুন, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, নকশাল আন্দোলন, অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক হিংসা- মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় সব লেখাতেই ব্যক্তি সম্পর্কের টানাপোড়েন, যৌনতা, প্রেম, সমাজ অর্থনীতির বিবিধ জটিলতা স্থান পেয়েছে। আপাত তুচ্ছ বিষয়ের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের গভীর সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি, জীবনবোধ, সমাজের প্রান্তে থাকা জনসাধারণের প্রতি অসম্ভব দরদ আমাদের বিস্মিত করে। মানি মার্কেটের ধ্বস সমাজের কী টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরী করতে পারে 'কপিল নাচছে' গল্পের প্রারম্ভে তার উল্লেখ আছে। সংকট থেকে উত্তরণের কথা তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। চেষ্টা, নিষ্ঠা, একাগ্রতাকে অবলম্বন করে মানুষ সংকট থেকে উন্নীত হতে পারে। পেশায় তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সাংবাদিক। লস অ্যাঞ্জেলস, মস্কো অলিম্পিক, দিল্লী এশিয়ান গেমস তিনি কভার করেছেন। তাঁকে পৃথকভাবে চেনা যায় ঘোর গ্রীষ্মে জলকলের ঠাসাঠাসি লাইনের ছবিতে (জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ), চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারির ধাক্কায় বা নিজের বাড়ির স্বপ্নপূরণে মধ্যবিত্তের মরিয়া খরচ বাঁচানোর রোজনামচাতে (কপিল নাচছে, চতুর্থ সীমানা), আদিবাসী মেয়ের ফেনাভাত খেয়ে ফুটবলে মর্যাদা লাভের গল্পে, ক্যানসারকে তুচ্ছ করে বিদেশি যুবার দুঃসাহসী সাইকেল অভিযানের নিউজ স্টোরি রচনায়, হার্ট ডিজিজে কাবু কিশোরের অ্যান্টি রবার্টস হওয়ার ব্যর্থ স্বপ্নের কথা লেখায় (অপরাজিত আনন্দ) মতি নন্দী অসামান্য। ক্রিকেট, ক্রীড়া সাংবাদিকতা তাঁর পেশা ও নেশা হলেও তাঁর সাহিত্যকীর্তি চিরভাস্বর থাকবে।

৩১০.৩.১১.২ : গল্পের ভাববস্তু, গল্পের নামকরণ এবং মৃত্যুপ্রসঙ্গ

'শবাগার' গল্পটি লেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিগর্ভ সময়ে- ১৯৭০-৭১ সালে। নকশাল আন্দোলনে সরকারি হিসাব অনুযায়ী সে সময় রাজ্যে খুন হয়েছে আড়াই হাজার তরুণ। মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসেও হাজার চুরাশিতম ব্রতী চ্যাটার্জীর মৃত্যুর কথা আছে। এই অগ্নিগর্ভ সময়ে তরুণ যুবকের জীবন বিপন্ন। প্রশাসন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এমনকি তরুণ যুবকের আত্মীয় পরিজনও তাদের রক্ষা করতে, তাদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসছে না। সন্তানদের চোখে পিতৃপুরুষের প্রতি অসম্ভব ঘৃণা, আর সন্তানের বিপন্ন জীবনের জন্য চিন্তাগ্রস্ত বাবা, পিতৃকুল। গল্পের শুরুতেই তাই দেখা যায়- খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চারটি মৃত্যু সংবাদের খবর। চারজনেরই মৃত্যু হয়েছে করোনারিথ্রম্বোসিসে।তাদের সকলেরই বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধে। মুকুন্দর স্ত্রী লীলাবতী জানায় "থম্বসিস হয়েই তো ছোটঠাকুরঝির শ্বশুর আপিস যাওয়ার সময় মরে গেল।" গল্পের প্রথম পর্বে বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গ এসেছে। মুকুন্দকে যদি এই বয়স্ক মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ধরা যায় তাহলে দেখব তরুণ যুবক অর্থাৎ আঠারো বছর থেকে বাইশ তেইশ বছর বয়সী সন্তানদের জন্যই তাদের দুশ্চিন্তা। এবং দুশ্চিন্তা থেকেই করোনারি থ্রম্বসিস। মুকুন্দের বাইশ বছরের ছেলে মনু তথা মানবেন্দ্র সেন। কলেজে পড়ে। বাবার প্রতি দুটি ঘটনায় ঘৃণার প্রকাশ দেখেছি। প্রথমত শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরার ঘটনায়,দ্বিতীয়ত নিজের সন্তানের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানোর ঘটনায়। এই সংকটময় মুহূর্তে, অগ্নিগর্ভ সময় মুকুন্দ দেশ-রাষ্ট্রের বৃহত্তর কথা না ভেবে, সমস্যা না ভেবে, সমস্যা উত্তরণের কথা না ভেবে ভোগ লালসায় ব্যস্ত। আমরা আগেই বলেছি, পিতৃপুরুষ এই তরুণ যুবকের জন্য সংগ্রাম, প্রতিবাদের পথ বেছে নেয়নি। তারা বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি তরুণ যুবকের কাছে। মুকুন্দের অফিসের সহকর্মী অজিত ধর একান্ন বছর বয়সে পা দিয়েছে। তার স্বাস্থ্যটি চমৎকার। সে বিয়ে করেনি, সন্তান সন্তানাদির প্রসঙ্গই নেই। সেদিক থেকে চিন্তামুক্ত। তাই তার থ্রম্বসিস হবার সম্ভাবনা কম। মুকুন্দর করোনারি থ্রম্বসিসে মৃত্যু হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই মৃত্যুর পর লাশ চিহ্নিত করতে না পেরে যাতে তার ছেলে মনু বমি না করে তাই একটা কাগজে নিজের নাম ঠিকানা লিখে পকেটে রেখে দিয়েছে।

গল্পের দ্বিতীয় পর্বে শুধু তরুণ যুবকের হত্যালীলার দৃশ্য।"আজ সকালে আমাদের পাড়ার মধ্যে একটা খুন হয়েছে।..পাইপ গান দিয়ে মেরেছে। বছর আঠারো বয়স হবে।"প্রতিটি যুবকের মৃত্যুর মধ্যে নৃশংসতা আছে, মৃত্যুর ভয়াবহতা আছে। তবু যুবকেরা প্রতিস্পর্ধী, প্রতিবাদী। তাদেরকে ধরার জন্য তাদের বন্ধুদের সাহায্য নেওয়া হয়। ধরিয়ে দিলে হয়তো নিজে প্রাণে বেঁচে যায়। নাহলে চলে অকথ্য অত্যাচার। মুকুন্দ অফিসের লিফটে ওঠার সময় শুনতে পায় "ভাগ্নেটা পরশু মার্ডার হয়েছে। এখনো লাশ পাওয়া যাচ্ছেনা।"হয়তো আগের মৃত্যুর সঙ্গে একটা যোগসূত্র পাওয়া যাবে।মুকুন্দের অফিসের লিভ সেকশনের শিশির নামের নতুন ছেলেটি জানায়-"আমার পাশের বাড়ির ছেলেটাকে মাসখানেক আগে পুলিশ রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এমন মেরেছে যে হাঁটুদুটো এখনও ভালো করে মুড়তে পারে না। আমি জানি ছেলেটা কোনো গোলমালে নেই। শুধু ডাঁটো বয়সের জন্যই ওর সর্বনাশ হল।" শিশিরের বয়স পঁচিশ বছর হলেও সে ধুতি পাঞ্জাবি চটি পরে। এই বয়সের যুবকেরা সংকটের মুখে। সন্দেহ- অনিশ্চয়তার মধ্যদিয়ে তাদের

বিপন্ন জীবনের চিত্র দেখেছি। শিশির ফুটবল খেলোয়ারের কোটায় চাকরি পেয়েছে। এই শরীরটাই ওর সর্বস্ব। চাকরি এখনও কনফার্মড নয়। এই পরিস্থিতিতে সন্দেহবশত পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়ে মারধোর করলে চাকরিটা আর টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবেনা।

অফিস থেকে ফেরার পথে মুকুন্দ আর একজন যুবকের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। পুলিশ মুকুন্দকে জিজ্ঞেস করে, পাড়ায় কারা কারা বোমা ছোঁড়ে। মুকুন্দ বলেনি কিছু। একটা লাশ এর সামনে এসে আইডেন্টিফাই করতে বলে পুলিশ। অবচেতনেই অস্ফুটস্বরে নট্রে 'মনু' নামটি উচ্চারিত হয়। মনু নয় তবে মনুর মতই দেখতে। "চোখের পাতা খোলা, নীল জামাটা ফালা হয়ে পিঠ উন্মুক্ত, কঠিনভাবে আঙুলগুলো মুঠো করা, ঠোঁটদুটো চেপে রয়েছে, গলায় গভীর ক্ষত। হিঁচড়ে টেনে আনার দাগ প্যান্টে। গলা থেকে চোয়ানো রক্ত থকথকে হয়ে উঠতে শুরু করেছে।" আবার একটি ভয়ংকর বীভৎস মৃত্যু। গল্পের সমাপ্তিতে আবার একটি ভয়ংকর মৃত্যুর সাক্ষাৎ পাই। এবার তাজু, মনুরই বয়সী। দুটো লোক পিস্তল রাইফেল পরিবৃত হয়ে একটা লাল ডোরাকাটা নিথরদেহ বহন করে নিয়ে গেল। টপটপ করে রক্ত ঝরেছে। তাজুর এই পরিণতির সংবাদ পাবার পরপরই মনু মুকুন্দর গায়ে বমি করে। মুকুন্দও গৌরাঙ্গের সামনেই শিপ্রাকে জড়িয়ে ধরে।

মতি নন্দী সাংবাদিক। তাই প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সাংবাদিকের ক্যামেরার লেন্স সর্বত্র বিচরণ করেছে। মুকুন্দ বা মুকুন্দর বয়সী, যারা পঞ্চাশোর্ধ, তাদের মৃত্যুর কারণ, অমানবিকতা, উদাসীনতার একটা চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। যদি থ্রম্বোসিসে চলন্ত বাসে মুকুন্দের মৃত্যু হতো, সহযাত্রীরা তার সম্বন্ধে বা মৃতদেহ সম্পর্কে কী ভাবতো, তার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। তার মৃতদেহ থানায় বা হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা বলবে, কেউ বলবে, মরেই যেহেতু গেছে তাই আর অফিস লেট করে লাভ নেই, এখানেই নামিয়ে দিলে পাবলিক বা পুলিশ ব্যবস্থা করে নেবে। এটা শুনে কেউ হাঁফ ছাড়বে, দু-একজন আপত্তি জানিয়ে বলবে, রাস্তায় নামিয়ে দেওয়াটা নিষ্ঠুর দেখাবে, বরং বাসের একটা সিটে বসে থাকুক। সবাই অফিসে নেমে গেলে হাসপাতালে বা থানায় পৌঁছে দিলেই হবে। অফিসের অজিত ধর লিফটে উঠতে উঠতে বলবে— "বারো বছরের কলিগ মুকুন্দ সেন আজ পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ। যা দিনকাল, মার্ডার-টার্ডার হল কিনা কে জানে। লোকটা অবশ্য একদিক থেকে ভালই ছিল, পলিটিক্স করতনা, তবে মদ-টদ খেত শুনেছি।" অন্যদের দৃষ্টিতে দেখা মুকুন্দের মৃত্যু হলে তাদের প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায়, মানুষ কি অমানবিক, নিষ্ঠুর। কোনো সমবেদনা নেই। এই পরিস্থিতি শোধনের কোন প্রয়াস নেই। সন্তান কেন তাদের ঘৃণা করবেনা। এই পরিস্থিতির জন্য মনু মুকুন্দকে সরাসরি দায়ি ক'রে বলে— "তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য। তুমি আমায় করাপ্ট করেছ।" মুকুন্দ তার সন্তানকে ভয় পেতে দেখেছে। গৌরাঙ্গের মতোই তার চাহনি। তাহলে কি মনুও গৌরাঙ্গের মতো ক্যানসার আক্রান্ত। এই ক্যানসার অসততার, স্বার্থপরের, মিথ্যাচারের- এ এক সামাজিক ব্যধি। পিতা-পুত্র সকলেই তাতে আক্রান্ত। মৃত্যু ছাড়া এর কোন ওষুধ নেই। 'শবাগার' গল্পে শুধু দৈহিক মৃত্যুর প্রসঙ্গ আসেনি। আত্মিক মৃত্যুর কথাও এসেছে। এসেছে জীবিত থেকেও মৃতের মতো আচরণের অনুষঙ্গ। গৌরাঙ্গ জীবিত, ক্যানসার আক্রান্ত। তার চোখেও অশ্রুবিন্দু। কিন্তু তা অসহায়ের,পরাজিতের অশ্রু। সেই অশ্রু মুকুন্দ কিছু সময়ের জন্য মনুর চোখে দেখতে পেয়েছে। শিশির জীবিত থাকলেও মৃত্যুর হাতছানি প্রতি মুহূর্তে। মুকুন্দ করোনারি থ্রম্বসিসে মৃত্যুর প্রহর

গুনছে। গল্পে যতগুলি সক্রিয় চরিত্র, তারা প্রত্যেকেই মৃত্যু নিয়ে ভাবিত। গল্প শুরু হচ্ছে চারজন বয়স্ক মানুষের করোনারি থ্রম্বোসিসে মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে। গল্পের উপান্তে তাজুর মৃত্যু ঘটনা এবং মনুর আত্মিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি। গল্পে একটিমাত্র পরিবারের কথা আছে। তথ্য নিলে দেখা যাবে, যতবার মুকুন্দ বাড়ি প্রবেশ করেছে বা বাড়ি থেকে অফিসে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছে ততবারই মৃত্যু প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। বাসে- অফিসে- লিফটে- রাস্তায়- শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা, মৃত্যুর আলোচনা। মৃতদেহ, শবদেহ, মৃত্যুর কারণ, কোনবয়সি মানুষের মৃত্যু- সমগ্র গল্পে বারবার অনুরণিত হয়েছে। তাই সাত এর দশকে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চল যেন মৃত্যুপুরী, শবাগার। নামকরণের তাৎপর্য এখানেই। 'পিকনিকের অপমৃত্যু' 'একটি মহাদেশের গল্প' এর মতো 'শবাগার' গল্পেও মৃত্যুভয়ের অনুষঙ্গ আছে। আর সরাসরি শবাগারের কথা তো গল্পে আছেই। জয়ার শ্বশুরকে পাঁচদিন পর মর্গে পাওয়া যায়, পচ ধরে বীভৎস দেখাচ্ছিল। মর্গে হয়তো বয়স্ক মৃত দেহের লাশের সন্ধান মিলবে, কিন্তু তরুণ যুবকের? কোন হদিশ পাওয়া যেতনা। সমগ্র গল্পেই এই মৃত্যু অনুষঙ্গ। নকশাল আন্দোলনের বীভৎসতাকেই চিহ্নিত করে।

৩১০.৩.১১.৩ : রচনাকৌশল

গল্পের আদ্যন্ত টেনশনের চোরাস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। গল্পে যতগুলি চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে প্রত্যেকেই প্রতি মুহূর্তে নিজের জন্য কিংবা সন্তানের জন্য আতঙ্কে, আশঙ্কায় দিন গুজরান করেছে। একটা টেনশনের আবহ তৈরি করেছে। অফিস ফেরত মুকুন্দের চোখে ধরা পড়ে "রাস্তা ক্রমশ ফাঁকা দেখাচ্ছে। পথচারী কম, গাড়িগুলি জোরে যাচ্ছে, সি আর পি ভরতি লরি তিন-চারবার চোখে পড়ল। ক্ষীণ বিস্ফোরণের শব্দও শুনতে পেল। .. যতই এগোয়, সবকিছু ভুতে পাওয়ার মতো ঠেকছে। বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। চাপা ফিসফিস শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার ছাদে আবছা মুখের সারি।... নিজের পায়ের শব্দে মুকুন্দর এবার মনে হতে লাগল কেউ পিছু নিয়েছে।"

এই আবছা মুখের সারি যেকোনো মুহূর্তে অস্ত্র হাতে এসে পড়তে পারে। সাদা পোশাকের বা সাধারণ পোশাকের পুলিশ হতে পারে, মনুর বয়সের যুবকেরা হতে পারে। আবার মুকুন্দকে লাশ সনাক্ত করতে বলা হলে বারবার নিজের সন্তানের বিপন্নতার কথাই তার মনে পড়ে। মনুকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় থানায়। মনুর প্রাণের প্রতি দরদের দৃশ্য মুকুন্দ দেখেছে। মনুর মতো মুকুন্দও ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত। নিজে স্বীকারও করেছে "তোর জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। সব বাবাই পায়। এটাকাপুরুষতা নয়।" আমরা অনুমান করে নিতে পারি, করোনারি থ্রম্বোসিসে যাদের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে খবরের কাগজের পাতায়, তারা সকলেই তরুণ-যুবক সন্তানের চিন্তাতেই, টেনশনেই আক্রান্ত হয়েছে। কোনো মহিলা নয়, পুরুষ-পিতৃস্থানীয় এবং যারা তরুণ যুবক তাদের টেনশনকেই গল্পকার সময়ের স্মারক হিসাবে তুলে এনেছেন। গল্পের বিষয় প্রকাশের গদ্য নির্মেদ, ঋজু, প্রাণবন্ত। এ গদ্যসাংবাদিকের, কবির নয়। গল্পের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে পিতা-পুত্র তথা মুকুন্দ-মনুর আখ্যানই প্রাধ্যান্য পেয়েছে। মুকুন্দ মনুকে বা মনু বাবাকে কীভাবে দেখেছে— সেই বৃত্তটি বেশি করে দেখানো হয়েছে। স্বল্প পরিসরে অজিত ধর, শিশির নামের ছেলেটি, তাজু, শিপ্রা, গৌরাঙ্গ,

লীলাবতির কথা স্থান পেয়েছে। শিপ্রা-মুকুন্দর সম্পর্ক সূত্রটি পিতৃস্থানীয় চরিত্রের একটি দিক প্রকাশ করেছে। যদিও গল্পে দু-একটি ক্ষেত্রে অশালীন শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তা ঘটনা ও চরিত্র প্রকাশক। গল্পটি মতি নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে সময়ের দাবিতে অন্যতম।

৩১০.৩.১১.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'শবাগার' গল্পের ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

২. 'শবাগার' গল্পে মৃত্যুর ভয়াবহতাকে রূপ দেওয়া হয়েছে — প্রসঙ্গসহ ব্যাখ্যা করো।

৩. নকশাল আন্দোলনের দলিল 'শবাগার' গল্পটি — আলোচনা করো।

৪. 'শবাগার' গল্পে আদ্যন্ত টেনশনকে প্রবাহিত করে দিয়েছেন লেখক — আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৩১০.৩.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। শ্রেষ্ঠগল্প; মতিনন্দী।

২। ছোটগল্পের বিষয়-আশয়; সুমিতা চক্রবর্তী।

৩। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০); অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

৪। পাঠসরণিতে মতি নন্দী; রবিন পাল।

৫। বাংলাসাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার; শ্রী ভূদেব চৌধুরী।

একক - ১২

ভেবেছিলাম

সন্তোষকুমার ঘোষ

বিন্যাসক্রম

৩১০.৩.১২.১ : লেখক পরিচিতি

৩১০.৩.১২.২ : ভেবেছিলাম

৩১০.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১০.৩.১২.১ : লেখক পরিচিতি

পেশায় সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৪) বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে সুপরিচিত নাম। তার কাছাকাছি সময়ের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পকার হলেন সুবোধ ঘোষ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। তাঁর তিন খণ্ডে প্রকাশিত গল্প সংকলনে মোট গল্প আছে একশ চোদ্দটি। সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, মনোবিকলন প্রভৃতি তাঁর গল্পে ঘুরেফিরে এসেছে। মৌলিক ভাবনাসূত্রে তার গল্পগুলি হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্রমাত্রার। একটি সাক্ষাৎকারে লেখক জানিয়েছিলেন যে তিনি মনে করেন, 'সব লেখাই মূলত আত্মজৈবনিক। অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই'। এই আত্মজৈবনিকতার সূত্রে তাঁর অনেক গল্পে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। সাংবাদিকতা পেশার সূত্রে তিনি কাজ করেছেন স্টেটম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকায়। পেশা ও জীবন অভিজ্ঞতার কারণে তাঁর গল্পে মধ্যবিত্তের সংকট ও জীবনজিজ্ঞাসা উঠে এসেছে বুদ্ধিবৃত্তির সাহচর্যে।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের ফরিদপুরের রাজবাড়িতে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা সুরেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পেশায় সাংবাদিক। পেশার কারণে তিনি কলকাতায় থাকতেন। সন্তোষকুমার ঘোষও কিছুদিন পর মায়ের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে এন্টালিতে পরে মির্জাপুর স্ট্রিটে, রাধানাথ মল্লিক লেনে একটিমাত্র ঘরে তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসে এই গলির বিবরণ বার বার এসেছে। আলোচ্য 'ভেবেছিলাম' গল্পে গল্পকথকের কলকাতায় বসবাসের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা এসেছে এই অভিজ্ঞতা সূত্রে।

৩১০.৩.১২.২ : ভেবেছিলাম

অদ্ভুত আঁধারের পৃথিবীতে চারপাশে কেবলই গ্রাম পতনের শব্দ হয়। মানুষের যথার্থ বাঁচবার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। 'সমাজ জীবনের অখণ্ডতা নাগরিক জীবনের মেট্রোপলিটন স্তরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়'। অর্থ, খ্যাতি, লোভ-লাভের নানামাত্রার হিসেবে মানুষ শহরমুখী হয়। মফসসলের অভাবী পরিবারের সদস্যরা ভাবে কলকাতায় এলে এক ভোজবাজিতে তাঁদের সব অভাব দূর হয়ে যাবে। অভাবী গ্রাম জীবনের স্বপ্নিল কৈশোরের চোখে শহর কলকাতা রূপকথার স্বপ্নপুরী; 'সেখানে মা দিদিকে মারবে না, মনি অর্ডারের জন্য পিওনের পথ চেয়ে কানা হবে না। গ্রামের বাড়ি, বড় স্যাঁতসেঁতে আর উদলা, বেআব্রু। ঝকঝকে, খটখটে কলকাতা, দেয়ালে দেয়ালে ঘেরা, আলোয় আলো'।

দূর থেকে শহর কলকাতাকে নিয়ে যে ফ্যান্টাসি তৈরি হয়, কলাকাতায় আসবার পর তা অচিরেই ভেঙে যায়। সাপের বাচ্চার মতো কিলবিলে, অন্ধকার নোংরা গলির একটি ঘুপচি ঘরে বাবা-মা-দিদির সঙ্গে গল্পকথকের থাকবার ব্যবস্থা হয়। গ্রাম বাংলার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি টাল খেয়ে পড়ে শহর কলকাতার বুকে। দিশেহারা বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই যান্ত্রিক শহরের যন্ত্রণাময় জীবন সংগ্রাম শুরু হয়। আরো ছ-ঘর ভাড়াটের সঙ্গে কলতলাটা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। বিত্ত-বৈভবের কলকতা শহর মা-কে ঘুরিয়ে দেখানোর সুযোগ হয় না। কলকাতায় আসবার পর মা, 'মাসখানেক ধরে শুধু হাঁড়িই ঠেলল। ঠেলে ঠেলে তার হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি'। কারখানার মালিকানা বদলের কারণে বাবার কাজ চলে যায়। ক্রমাগত দিনগত পাপক্ষয়ে একদা দরাজ মনওয়ালা মানুষটি নিজের সন্তানকে 'শুয়ার-কা-বাচ্চা' বলে বসেন!

যে স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে আসা, খুব দ্রুতই তা অলীক মনে হতে থাকে। গ্রামের অভাব, অভিযোগে দূরত্বের কলকাতা শহর ছিল ভরসার জায়গা। তখন ভাবনা ছিল কলকাতায় যেতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। গল্পটি শুরু হয়েছে সেই স্বপ্ন কথন দিয়ে'আমরা ভাবতাম, কলকাতায় এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'। বাস্তবে ঘটেছে তার বিপরীত। সবুজহীন মেট্রোপলিটন শহরে কারখানার কাজ হারিয়ে বাবা মানুষটি ক্রমাগত রুক্ষ হয়ে ওঠেন। আর্থিক অনটন সূত্রে স্বভাবও পালটাতে থাকে। জীবনের অনিশ্চয়তায় তিনি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন। আসলে মেট্রোপলিটন শহরে সর্বত্র জনতার চাপ আর জনতার উত্তাপ'ঘরে স্থান নেই রাস্তায় স্থান নেই ট্রেনে ট্রামে বাসে স্থান নেই অফিসে স্থান নেই ইডেন উদ্যান থেকে শশ্মান কোথাও তিলধারণের স্থান নেই'। এরই মধ্যে চূড়ান্ত আর্থিক সংকটে আত্মীয়-পরিজন এসে পড়লে তাদের একপ্রকার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়। মফসসলে যে মানুষটি সকলকে সাহার্য্য করত উপার্জিত অর্থ সব খরচ করে, সে-ই মানুষই আমূল পালটে গেলো শহর কলকাতার জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে।

গল্পের চূড়ান্ত পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় মেয়েটিকে পাত্রস্থ করবার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। প্রতিবেশি জি-পি-ও পত্নীর চটকদার শাড়ি ধার করে মেয়েটিকে পাত্রপক্ষের সামনে উপস্থিত করা হয়। যদিও আর এক প্রতিবেশী যুবক নিমাইয়ের কাছ থেকে পাত্রপক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়'পাত্তর না ছাই। বিয়ে না ঘোড়ার ডিম। ওদের আমি চিনি। মেয়েছেলের টাউট। তোর বাবা বেচে দেবে বলে ধরে এনেছে'। এই অভিঘাতে

মেয়েটি গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে রক্তারক্তি কাণ্ড বেঁধে যায়। ডাক্তার এসে পরিস্থিতি সামলে নিলেও পরিবারটি মানসিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। একই ঘরের মধ্যে থেকেও তারা সকলে যেন আলাদা মানুষ 'যেন এক ঘরে তিনজন না, ট্রেনের এক কামরার তিনজন'।

যে সুখস্বপ্নের জন্য কলকাতায় আসা তা ব্যর্থ হয়। দেশের বাড়ির অভাব-অনটনে তবু কলকাতাকে ভরসার জায়গা হিসাবে ভাবা হত। কিন্তু কলকাতার অনিকেত জীবনযাপন তাঁদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে; আর কোন নতুন ভূখণ্ড নেই যা ভরসার জায়গা হয়ে উঠতে পারে, ভাল ভাববার মতো আর কিছু রইলো না। কথক জানিয়েছেন 'দেশের বাড়িতে যখন ছিলাম,তখন এরকম হত, তবু তখন কলকাতা ছিল। ভাবতাম কলকাতা এলেই ... এলাম, অথচ আসাও হল না। তার চেয়ে বড় কথা, এই ক'বছরে আর একটা কলকাতাও তৈরি করা হয়নি, আমাদের আর কোনও কলকাতাই রইল না'। গল্পের এই সমাপ্তি গল্পটিকে একটা ট্র্যাজিক পরিণতি দান করেছে। 'ভেবেছিলাম' গল্পটি শেষ পর্যন্ত শিকড়চ্যুত মানুষের দগ্ধ জীবনচিত্রকে তুলে ধরে।

৩১০.৩.১২.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. 'যেন এক ঘরে তিনজন না, ট্রেনের এক কামরায় তিনজন; যে ট্রেন আমাদের এখানে এনেছে'—মধ্যবিত্ত পরিবারের অবক্ষয়ের যে চিত্র এখানে উঠে এসেছে তা আলোচনা করো?

২. 'আমরা ভাবতাম, কলকাতা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে'।—গল্পটি অবলম্বনে উক্তিটির বিচার করো?

৩. সন্তোষকুমার ঘোষের 'ভেবেছিলাম' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো?

৩১০.৩.১২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। শ্রাবণী পাল (সম্পাদিত), 'বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক', অক্ষর প্রকাশনা।

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি।

৩। শ্রীভূদেব চৌধুরী, 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

৪। নায়ারণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প বিচিত্রা', কবি প্রকাশনা।

৫। অলোক চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক,' আশাদীপ প্রকাশনী।

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক - ১৩

গাছটা বলেছিল

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

বিন্যাসক্রম

৩১০.৪.১৩.১ : লেখক পরিচিতি

৩১০.৪.১৩.২ : কাহিনি সংক্ষেপ

৩১০.৪.১৩.৩ : কাহিনি বিশ্লেষণ

৩১০.৪.১৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩১০.৪.১৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৩১০.৪.১৩.১ : লেখক পরিচিতি

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩০ সালে ১৪ই অক্টোবর মুর্শিদাবাদের খোশবাসপুরে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন স্থিতধী, নম্রভাষী, আত্মপ্রচার বিমুখ মানুষ। নিজেকে একজন বক্তব্যজীবী লেখক হিসেবে পরিচয় দিলেও তিনি আসলে গভীর জীবনবাদী তথা বাস্তববাদী, সামাজিক চিত্রকর ও রসজ্ঞ কথাশিল্পী। তাঁর রচনায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ইসলাম ও হিন্দু সংস্কৃতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী রাঢ় বাংলার একজন সার্থক কথাকার সিরাজ রাঢ় বাংলার লোকনাট্য 'আলকাপ' এর সঙ্গে যুক্তথেকে নাচ-গান-অভিনয়ে নিমজ্জিত হয়ে জেলায় জেলায় ঘুরেছেন। ফলে জগৎ ও জীবনকে উপলব্ধি করেছেন বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে।

প্রকৃতি ও মানুষের যে আদিম সম্বন্ধ সেটাতিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বার বার তাঁর বিভিন্ন রচনায়। কবিতা রচনা দিয়ে সিরাজের সাহিত্য জগতে প্রবেশ। পরবর্তীকালে তিনি মননশীল প্রবন্ধ, উপন্যাস ও গল্প রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইবলিশ ছদ্মনামে প্রকাশিত প্রথম গল্প 'কাঁচি' বহরমপুরের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'মায়ামৃদঙ্গ', 'উত্তর জাহ্নবী', 'তৃণভূমি', 'হিজলকন্যা'

প্রভৃতি। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'তরঙ্গিণীর চোখ', 'ভারতবর্ষ', 'গোঘ্ন', 'অঘ্রানে অন্নের ঘ্রাণ', 'নীলার জন্য', 'মানুষের জন্ম' ইত্যাদি। এছাড়া রহস্যমূলক কিশোর উপন্যাসের জনপ্রিয় কর্নেল চরিত্রের স্রষ্টা সিরাজ।

বাংলা ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত, আরবি, ফরাসী ও উর্দুতেও সমান দক্ষ ছিলেন সিরাজ। একাধিক ভাষার সাহিত্যবোধ একাকার হয়েগিয়েছিল তাঁর চোখে দেখা ভূমিজ লোকসংস্কৃতির সঙ্গে। তিনি গড়ে তুলেছিলেন ব্যতিক্রমী সাহিত্য ভুবন। যে সমস্ত মানুষের কথা সাহিত্যের পাতায় স্থান পায়নি, সেই সহজ-সরল গ্রাম্য দরিদ্র মানুষের কথা তিনি লিখে গেছেন অনায়াস দক্ষতায়। তিনি একজন যথার্থ সাহিত্যিক। তিনি মূলত মানব জীবনের গল্পকার। সঙ্গতি—অসঙ্গতি, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, ধার্মিকদের ভণ্ডামি, প্রেম-বাসনা, হিংসা-প্রতিহিংসা নিয়ে চিরকালের যে মানব জীবনধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারই শিল্পরূপ এঁকে গেছেন সিরাজ।

গভীর অভিজ্ঞতা, নিবিড় সহানুভূতি ও স্বচ্ছ জীবনবোধের সঙ্গে সিরাজের ছিল অতুলনীয় সাহিত্য প্রতিভা। উদ্দেশ্য, অভিজ্ঞতা, অনুভব ও শিল্প প্রতিভার সমন্বয়ে বাংলা গল্প জগতের তিনি একজন সত্যি অলীক মানুষ হওয়ার দাবি রাখেন। গল্প সম্পর্কে সিরাজের অভিজ্ঞান 'স্তূপাকার জ্ঞানই আমাদের অভিজ্ঞতা। তার থেকে একটুখানি বেছে নিয়ে ভাঙচুর করার ব্যাপারটাই আসলে শিল্প এবং শেষাবধি তার পরিণাম একটা আখ্যান। যা গল্প নামে পরিচিত।' ছোটগল্পকার সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ আলাদা মনোযোগ ও সম্ভ্রমের দাবি রাখেন। অজস্র গল্প লিখেছেন শুধু নয়, সেগুলি বৈচিত্র্যেও বিস্ময়কর। গ্রাম ও শহরের কত মানুষ তিনি দেখেছেন,কত হাসি ও কান্না দেখেছেন তার সীমা নেই। দেখেছেন মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ। দেখেছেন মানুষের প্রেম বিষাদ নিঃসঙ্গতা। যে অদৃশ্য তাঁতি আমাদের জীবনের তাঁতে সাদা কালো বা রঙিন সুতোয় বুনে চলেছেন, তার খবর তিনি দিয়েছেন। কখনো তিনি নিজে বক্তা। কখনো গল্পের চরিত্রের ঘটনার ব্যাখাতা। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সিরাজ তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল আলোয় বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ভুবনকে চিরদিনের জন্য আলোকিত করে রেখেছেন।

৩১০.৪.১৩.২ : কাহিনি সংক্ষেপ

বুড়ি গিয়েছিল গাছটির তলায় পাতা কুড়োতে। গাছটা তাকে বলল, ম র্ম র্মি ভয় পেয়ে বুড়ি বাড়িতে পালিয়ে এলো, আর মরে গেল। তারপর তদন্ত শুরু। গ্রামের মানুষ-মোড়ল, শিক্ষক, যুক্তিবাদী সবাই মিলে বলল হার্ট অ্যাটাকেই বুড়ি মারা গেছে। অথচ ডাক্তার অসীম বোস বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে চান। গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে- কথা বলা গাছটিকে তিনি চাক্ষুষ করতে ইচ্ছুক। তারপর তিনি গাছের কাছে গিয়ে 'হ্যাল্লো' বলতেই শুনতে পান, গাছটা তাকে বলছে- ম র্ম র্মি পরদিন সকালে অসীম বোসের মৃত্যু-সংবাদ আসে। যদিও তার বিছানার পাশে একটুকরো কাগজে লেখা ছিল আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। তিনি নাকি সায়ানাইড খেয়েছেন। কিন্তু কেন? তার উত্তর মেলেনা। তার ফলে গাছটিকে বিপজ্জনক মনে করা হয়। পঞ্চায়েত থেকে গাছটিকে কেটে ফেলার কথা ভাবে অথচ কিছু মানুষ গাছটিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতে থাকে। হিন্দু পাড়া ও মুসলমান পাড়ার মাঝে নো-ম্যান্স-ল্যান্ডে মাথা তুলে দাঁড়ানো গাছটিকে নিয়ে গ্রামে রণক্ষেত্রের পরিবেশ তৈরি হয়। এ থেকে বোঝা যায়— কুসংস্কার জিনিসটা এক শ্রেণির ভাইরাস, যা মহামারী বাধায়।

৩১০.৪.১৩.৩ : কাহিনি-বিশ্লেষণ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সাহিত্য তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন ও জীবনদর্শনের ফসল। তিনি মূলত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জনপদকে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন। লোকজীবনের বিভিন্ন দিক, নাগরিক জীবনের কুটিলতা, সংস্কার-কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলি সিরাজের গল্পে ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান প্রকৃতি ও মানুষ। সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্পে একইসঙ্গে আছে ভোট-রাজনীতির সঙ্গে সংস্কারাশ্রয়ী মনোবিকলন ও জাগতিকতার টানপোড়েনের জীবন রহস্য। গাছ নিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন তিনি কিন্তু এই গাছটার মতো তারা কেউ মানুষের ভাষায় কথা বলেনি। এই গাছটার মানুষের ভাষা নকল করার ক্ষমতা ছিল।

এই গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় লোকজ-বিশ্বাস আর প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক, এ তিনের সমন্বয়ে গল্পটি সিরাজের কলমে অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। এই গল্পের কথা বলা গাছ পাঠকের মনে রূপকথার ছায়া আনলেও আসলে এই অলৌকিক সংগঠনে বাস্তব ভিত্তি লেখক আমাদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমগ্র গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই গল্পে পরপর কয়েকটি রহস্যজনক ও আশ্চর্য মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। যা আমাদের বিস্মিত ও ভীত করে তোলে। গাছটা বলেছিল ম র্ম র্ম র্আর সেই উচ্চারণে একের পর এক মানুষের মৃত্যু ঘটছিল। মৃত্যুর দূত হয়ে ওঠা অপুষ্পক এই গাছটি ক্রমেই যেন গ্রামের মানুষের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে ওঠে। যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক সিরাজ বিভিন্ন চরিত্রের চোখ দিয়ে এই গাছের রহস্য নানাভাবে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি উন্মোচন হয়নি। এ যেন এক মায়াজালের সামনে এসে আমরা দাঁড়াই।

আসলে গ্রামীণ কুসংস্কার, অলৌকিক বিশ্বাস এবং রাজনীতি কীভাবে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, একে অপরের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠেএগল্পে সিরাজ সেটাই সচেতনভাবে দেখিয়েছেন।

এই গল্পের পটভূমি বসন্ত ঋতু। সময় ১৯৮৮ সাল। আশ্চর্য চমকে পাতাকুড়ুনে বুড়িকে দিয়ে গল্পের শুরু। গাছের তলায় পাতা কুড়োতে গিয়ে বুড়ি শুনতে পায় গাছের সেই অমোঘ স্বর ম-র্ম-র্মর। ভয় পেয়ে বুড়ি ঝাঁটা ফেলে বাড়ি পালিয়ে গেল আর মরে গেল। যদিও গ্রামের প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের শহুরে ডাক্তারের পর্যবেক্ষণে হার্ট অ্যাটাকে বুড়ির মৃত্যু হয়েছে। গাঁজাখোর সিনিক প্রৌঢ়, পাঁচু চোর, দারোগাবাবু এবং তরুণ ডাক্তার অসীম বোস। এরা প্রত্যেকে শুনেছিল গাছের ভাষা মর, র্ম র্ম র্যদিও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এদের প্রত্যেকের মৃত্যু হয়েছে শারীরিক অসুস্থতার কারণে, একমাত্র ডাক্তার ছাড়া। কিন্তু গ্রামীণ সংস্কার এতে কাটে না বরং অলৌকিকতার গন্ধ পান অনেকে। তাইতো গাঁয়ের বৃদ্ধ গাঁওবুড়ো বলেছিল

> 'কোনও কোনও গাছ কথা বলে। কোনও-কোনও গাছ রাগী, কুচুটে আর নিষ্ঠুর হয়।
>
> কিন্তু গাছেরা কি কথা বলে? বলতে পারে?
>
> বুড়ো বলেছিল পারে। তারা বাতাসের ভাষায় কথা বলে। ওই গাছটা বলেছিল।'

—আশ্চর্যের বিষয় এই গাছের কথা বলা এবং যে কোনো তুচ্ছ কথা নয়, একেবারে মানুষের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা! সিনিক প্রৌঢ় তার অবিশ্বাসী মন নিয়ে গাছটির কাছে গিয়ে রাগে গাছের গুড়িতে লাথি মারতে মারতে শুনতে পায় সেই ম র্ম র্ম র্ধ্বনি। আর তারপরেই হার্ট ফেল করে সে মারা যায়। আরপর পাঁচু চোর চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল নো-ম্যান্স-ল্যান্ডের ওই গাছটার কাছে। সেও তখন শুনতে পায় গাছটা তাকে বলছে ম র্ম র্ম র্ি তারপরেই বাড়িতে এসে লাংস বাস্ট করে মৃত্যু হয় তার, কারণ যক্ষার লাস্ট স্টেজ। দারোগাও শুনেছিল সেই মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা তারপরেই বুকে ব্যথা শুরু হয় ও মারা যায়। লেখক ও ডাক্তার অসীম বোস ফুল-ফল না হওয়া এই গাছটির নাম দেন 'বৃহন্নলা'। সমগ্র গল্পে মোট দশবার 'বৃহন্নলা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাসে মানুষের ভাষায় কথা বলা এই অলৌকিক গাছটিকে একদিন চাক্ষুষ করতে গল্পের কথকের সঙ্গে ডাক্তার অসীম বোস গাছটার কাছে হাজির হন। তারপর গাছের কাছে গিয়ে 'হ্যাল্লো' বলতেই শুনতে পান সেই অমোঘ স্বর ম র্ম র্ম র্ি পরদিন সকালে ডাক্তার অসীম বোসের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, বিছানার পাশে একটুকরো কাগজে লেখা ছিল সুইসাইড নোট। আসলে ডাক্তার অসীম বোসের মৃত্যু কোনো অলৌকিক কারণে বা অসুস্থতার জন্য হয়নি, প্রেমে প্রত্যাখ্যাত ডাক্তার আত্মঘাতী হন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' গল্পটিকে জাদুবাস্তবের আখ্যানও বলা যেতে পারে। কারণ জাদুবাস্তব তথা ম্যাজিক রিয়ালিজমের মূল কথা হলোযা কিছু চেনা পরিচিত আর ঘটমান তাকেই অলৌকিকতার মোড়কে পরিবেশন। তবে এই পরিবেশন এতটাই বাস্তবানুগ যে তাকে মিথ্যে বা অতিলৌকিক ভাবতে ভুল হতে পারে আমাদের। আসলে জাদুবাস্তবতার স্বাতন্ত্র্য ঐ বলবার ধরনের মধ্যে নিহিত। আলোচ্য গল্পের ক্ষেত্রে এমনটাই দেখতে পাওয়া যায়। গল্পের কথক বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কথা উল্লেখ করে জানান 'গাছ অনন্ত মৌনের প্রতীক'। তাঁর চোখে যা গ্রামের 'নো-ম্যান্স-ল্যান্ড' তথা পরিত্যক্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যার দুই পাশে অবস্থিত হিন্দু-মুসলিম অধ্যুষিত দুটি গ্রাম। প্রাচীন এই গাছটির ফুলফল কিছু নেই সে যেন উভলিঙ্গ বৃহন্নলা। গল্পটি আদ্যপান্ত লোকজ পুরাণ আশ্রিত একটি রাজনৈতিক গল্প। অতিপ্রাকৃত রূপকের আড়ালে এটি একটি জমি ও ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত। সরকারি জায়গা দখল করে ক্লাবঘর বানানোর জন্য গাছকে কেন্দ্র করে কুসংস্কার ও মৃত্যুভয় ছড়িয়ে দেওয়াটা এক সাজানো প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। একদিকে কথা-বলা গাছটাকে কেন্দ্র করে গাঁওবুড়োদের বিশ্বাস, বেতো নরেনবাবুর বৃক্ষদেব বানিয়ে পুজো করার চেষ্টা আর অন্যদিকে বিপজ্জনক ভেবে পঞ্চায়েত থেকে গাছটাকে কেটে ফেলার সরকারি নির্দেশএর মাঝখানে গল্পকথকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ বৃহন্নলা সকলকে মরতে বলে। মার মার মার স্লোগানে গ্রামে বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় বোমাবাজি, রণহুংকার আর গণমৃত্যু

> 'গাছটা বারবার বলে থাকবে মর্ মর্ মর্ কারণ লোকগুলি বারবার মরছিল। চাপচাপ রক্ত। নো-ম্যান্স্-ল্যান্ড রক্তে লাল হচ্ছিল। প্রকৃতিতে তখন বসন্তকাল। এ সময় মৃত্যুও রক্তিম সৌন্দর্য হয়।'

লক্ষণীয় গল্পের ঋতু বসন্ত। আসলে সৌন্দর্যের প্রতীক যে বসন্তের মাধুর্য প্রকৃতি থেকে মানুষের মনে নানা রঙ ছড়ায়। সেখানে এই বসন্ত মৃত্যুময়। যদিও লেখক সে মৃত্যুতেও 'রক্তিম সৌন্দর্য' খুঁজতে চান।

তাই বলা যায় এই গল্পটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের নয় বরং এই গল্পের গাছটা যেন প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে প্রতিশোধ নিতে এসেছে। আপাত অলৌকিক মায়াজাল ভেঙ্গে এই কথাই যেন লেখক বলেন আমাদের। এই গল্পের অন্যতম যুক্তিবাদী চরিত্র শিক্ষক মনজুর সমস্ত মৃত্যুর ঘটনায় কো-ইন্সিডেন্স খুঁজে পান এবং টাকার বিনিময়ে গাছটিকে ভয়ানক মৃত্যুর দূত বানানোর পরিকল্পনা চলছে সে কথা স্পষ্ট তুলে ধরেন। এই মায়াজাল আসলে গ্রামীণ লোকবিশ্বাসের, যেখানে গাছের মর্মরধ্বনি হয়তো ম র্ম র্ম র্হয়ে ওঠে। লেখকের উপলব্ধি

> 'আরে তাই তো! অতি অতি অতি প্রাচীন এই ধ্বনির প্রতিফলন মানবিক ভাষায়। গ্রীক-লাতিন-ফার্সি-সংস্কৃত-আরবীতে। মৃত্যুর পাশাপাশি সমান্তরাল হেঁটে চলা ধ্বনিপুঞ্জ। গাছেরা বলে। চলমান জল বলে। মরুভূমির বালি বলে। পাথরের বুক ঘেঁসে যাওয়া বাতাস বলে। আকাশের মেঘ বলে। মর্মর আর মৃত্যু হাতে হাতে....।'

বোঝা যায় এখানে প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা আর রীতিনীতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। রহস্যময়ী নাকি সর্বজ্ঞ প্রকৃতির খেয়ালেই নিয়ন্ত্রিত হয় মানবজীবন? এই প্রশ্নায়নে ডাক্তার ও গল্পের কথক ক্ষত-বিক্ষত হন।

উল্লেখ্য সারা শরীরে চন্দ্রচূর্ণমাখা উজ্জ্বল রহস্যময় সৌন্দর্যে পূর্ণ অনন্ত মৌনের প্রতীক, এই গাছ বৃহন্নলা অর্জুন। অনাথ,আতুর, একল-সেঁড়ে, নি-জেতে মুখ্যুসুখ্যু হ্যাংলা প্রকৃতির প্রতীক এই নানাবিধ অভিধায় আমরা গাছটাকে অভিহিত হতে দেখি। আর গল্পের শেষে লেখকের প্রেরণায় ঐ বৃহন্নলা অনন্ত মৌন ভেঙে যেন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে

> 'বৃহন্নলা! তুমি কথা বলো! বৃহন্নলা! এই সব দ্বিপদ প্রাণীদের তড়পানি কেন সহ্য করছ তুমি? তুমি স্বয়ং প্রকৃতি এ দৌরাত্ম অসহ্য।
>
> বৃহন্নলা! মুখ খোলো!
>
> আর অপ্রত্যাশিত বাতাসটা এলো। বৃক্ষলতা জুড়ে নো-ম্যানস্-ল্যান্ডে বিশাল স্লোগান। মার, মার, মার শালাদের, মার, মার, মার...।'

প্রকৃতিপ্রেমী সিরাজ গাছ ভালোবাসতেন। আর গাছের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ থাকার কারণে তাঁর গল্পে বারবার এসেছে গাছের প্রসঙ্গ। গাছ এখানে প্রধান চরিত্র। পরিবেশ-বীক্ষার নিরিখে এই গল্পটি পাঠ করলে আমরা সহজেই বুঝে যাই যে পরিবেশ ধ্বংসকারী, বৃক্ষচ্ছেদক মানুষের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদী।

গল্পটি জুড়ে যে মায়াবাস্তবের জাল এবং শেষেও যেন এই জাদুবলয় ভেঙেও না ভাঙার প্রকৌশল সিরাজ গ্রহণ করেছেন, গল্পটি সেখানেই সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। গাছের কথা বলা আর ক্রমিক মৃত্যুর ঘটনা; যে অবিশ্বাসী মন নিয়ে একের পর এক মানুষ গাছের কাছে যায় ও মরে। এইসব অকাল মৃত্যুর পিছনে রাজনৈতিক গন্ধ যেমন সত্য, তেমনই সত্য কুসংস্কার-ভাইরাসের আক্রমণে মহামারীর ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলিম পাড়ার সংযোগস্থলে পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ জমিতে একলা একটা উন্নত গাছ ক্রমশ মানবিক ভাষা শিখে যেন ভয়াল ও মারক হয়ে ওঠে।

সর্বোপরি, গাছকে কেন্দ্র করে মাটি দখলের লড়াই-এ দুই পক্ষের বোমাবাজি ও মৃত্যু। গল্পে গাঁওবুড়োর বিশ্বাস অনুসারে মানুষের ভাষার কথা বলতে শিখে যাওয়া এই ব্যতিক্রমী গাছটা মানুষের জীবনে ব্যুমেরাং হয়ে আসে। গল্পে যেন প্রকৃতি ও মানুষের দ্বৈরথে প্রকৃতির চূড়ান্ত জয় দেখা যায়। সেই জয়ের কাহিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে হৃদয়সংবেদী সিরাজ লিপিবদ্ধ করেছেন।

সভ্যতার মর্মে যে ক্লান্তি আর গভীর অসুখ তার আরোগ্যের জন্যই হয়তো কোনো কোন গাছ এভাবেই কথা বলে। পরিশেষ একটু সচেতনভাবে গল্পটি পড়লেই বোঝা যায় এই লড়াই না-নারী, না-পুরুষ তথা উভলিঙ্গ প্রকৃতির প্রতিশোধ।

৩১০.৪.১৩.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’ গল্পটি জাদু বাস্তবের আখ্যান আলোচনা করো।

২। গ্রাম্য অলৌকিক বিশ্বাস, পলিটিক্স এবং মৌন ভয়াল প্রকৃতি এই তিনের সমন্বয়ে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’ এক স্বতন্ত্র স্বাদের গল্প, যেন আধুনিক রূপকথা। বিশ্লেষণ করো।

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘গাছটা বলেছিল’ গল্পে শেষপর্যন্ত প্রকৃতি ও মানুষের দ্বৈরথে প্রকৃতির চূড়ান্ত জয় দেখা যায়। বিশদ আলোচনা করো।

৩১০.৪.১৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। ৫০টি গল্প সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (দে’জ)

২। কালের পুত্তলিকা অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (দে’জ)

৩। সমকালের জীয়নকাঠি (সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা) সম্পাদক — নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল

একক - ১৪

পিকুর ডায়রি

সত্যজিৎ রায়

বিন্যাসক্রম

৩১০.৪.১৪.১ : ভূমিকা

৩১০.৪.১৪.২ : সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিজীবন

৩১০.৪.১৪.৩ : সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য চর্চা

৩১০.৪.১৪.৪ : পিকুর ডায়রি গল্পের সারমর্ম

৩১০.৪.১৪.৫ : গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

৩১০.৪.১৪.৬ : গল্পের শৈলী

৩১০.৪.১৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৪.১৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩১০.৪.১৪.১ : ভূমিকা

শিশু ও কিশোরের মানসিকবৃত্তির বিশ্লেষণে সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য অনন্য। শিশু ও কিশোরদের বুদ্ধি, ধারণা, স্মৃতি, সৃজনশীলতাসহ যেসব উপাদান মানসিক বিকাশে সাহায্য করে তার প্রায় সবদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন সত্যজিৎ রায়। ভাষার বিকাশ, কল্পনা, সমাজচেতনা প্রভৃতি যে যে বিষয়গুলি একটি শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে সাহায্য করে; সত্যজিৎ রায়ের জনপ্রিয় ফেলুদা সিরিজ, প্রফেসর শঙ্কু কিংবা অন্যান্য গল্পগুলির বিষয়বস্তু সেভাবেই নির্মিত হয়েছে। আমরা জানি সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য মূলত শিশু ও কিশোরদের উদ্দেশ্য করেই রচিত, যদিও তা পরবর্তীকালে অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্যের মতো সকলের কাছেই তা সমানভাবে গৃহীত এবং প্রশংসিত হয়েছে। শিল্পী মনস্কতা ও শিল্পের প্রয়োগের উপর সজাগ দৃষ্টি, চোখে পড়ে সাহিত্যের নির্মাণেও। যে কারণেই শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যেও আমরা খুঁজে

পাই যুক্তিনিষ্ঠ শৈল্পিক কারুকার্য। আমাদের আলোচ্য 'পিকুর ডায়রি' গল্পটিতেও গল্পকার শিশুমনস্তত্ত্বের এক সূক্ষ্মদিকের উন্মোচন করছেন।

৩১০.৪.১৪.২ : সত্যজিৎ রায়ের ব্যক্তিজীবন

ব্যক্তি সত্যজিৎ রায়ের (২ মে ১৯২১ — ২৩ এপ্রিল ১৯৯২) জীবন পারিবারিক গৌরবের কারণেই সূচনাকাল থেকেই খুব সপ্রতিভ। তার জন্ম ২রা মে, ১৮ই বৈশাখ, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ কলকাতার গড়পারে, পিতু সুকুমার রায়, মাতা সুপ্রভা রায়। তার আদি পৈত্রিক ভিটা বর্তমান বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে অবস্থিত। সত্যজিতের পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাবা সুকুমার রায় দুজনেরই জন্ম হয়েছিল এখানে।কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের মতই মসুয়ার রায়চৌধুরী পরিবারও বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। যখন আড়াই বছর বয়স তখন তিনি পিতৃহারা হন, মাতা সুপ্রভাদেবীর সঙ্গে সত্যজিৎ ছয় বছর বয়স থেকে মামার বাড়িতে থাকেন। মায়ের কাছেই তার প্রাথমিক পড়াশুনা। সংসারের প্রয়োজনে সুপ্রভাদেবীকে একসময়ে বিদ্যাসাগর বানীভবন বিদ্যাশ্রমে সেলাইয়ের কাজও করতে হয়েছিল। এখানেই বালিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি . এ পাশ করেন ১৯৩৮ খ্রিঃ। বাবা এবং ঠাকুরদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই শিল্প সাহিত্যের প্রতিভা লাভ করেছিলেন সত্যজিৎ। স্কুলে থাকতে বাড়ির সংগ্রহের রেকর্ড শুনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দীক্ষিত হয়ে যান। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হিসেবে এর পাশাপাশি ব্রহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের প্রতিও অনুরাগ জন্মেছিল। চিত্রশিল্পের চর্চাও বাল্যবয়স থেকেই ছিল। বি. এ পাশ করার পর শিল্প শিক্ষার জন্য ভর্তি হন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। কিন্তু আধুনিকমনা সত্যজিতের পক্ষে এখানকার পরিবেশ মনঃপুত না হওয়ায় শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৪০ খ্রিঃ এপ্রিল মাসে তিনি ব্রিটিশ বিজ্ঞাপন কোম্পানি ডিজে কিমার সংস্থায় জুনিয়র ভিসুয়ালাইজার হিসেবে যোগ দেন। এই সময়েই তিনি সিগনেট প্রেস প্রকাশন সংস্থার বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা শুরু করেন। ছোটদের পত্রিকা মৌচাকেও তার প্রথম আঁকা অলঙ্করন প্রকাশিত হয়। অক্ষরলিপিতেও এই সময় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। পরবর্তীকালে অক্ষরলিপিতে রোমান টাইপ সিরিজ তার বিশেষ অবদান বলে স্বীকৃত হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানের আর্ট ডিরেক্টারের পদে উন্নীত হন। তার প্রথম চলচ্চিত্র পথের পাঁচালীর সাফল্যের পর ১৯৫৬ খ্রিঃ এই চাকরিতে ইস্তফা দেন। এরপর ১৯৬৬ খ্রিঃ পর্যন্ত পথের পাঁচালী বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্রোৎসবে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয়েছে। তার পরিচালিত প্রায় সবকটি ছবিতেই তার সৃজনশীল প্রতিভার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে ভারতীয় অন্য কোন ছবিতে ছিল দুর্লভ। তার পরিচালিত উল্লেখযোগ্য ছবি- অপরাজিত, অপুর সংসার, জলসাঘর, কাঞ্চনজঙ্ঘা, অভিযান, মহানগর, চারুলতা এবং শেষ দিককার ঘরে বাইরে, গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক প্রভৃতি। এছাড়া ১৯৬০ খ্রিঃ কবি সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় তার পিতামহ ও পিতার প্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকা নতুন করে প্রকাশ শুরু করেন। সম্পাদনা ও অলঙ্করণের পাশাপাশি নিজেও লেখা শুরু করেন। এভাবেই একে একেসৃষ্টি হয় ফেলুদা, তোপসে, জটায়ু, প্রফেসর শঙ্কুর মত বাঙালি শিশু — কিশোরদের প্রিয় কিছু সাহিত্যচরিত্র। চলচ্চিত্রকার হিসেবে সত্যজিৎ দেশের ও বিদেশের বহু পুরস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মান এবং ভারত সরকারের ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৮৯ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি ফরাসি প্রেসিডেন্ট মিতের কলকাতায় এসে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান লেজিয়ন অব অনার — এর স্বর্ণপদক প্রদান করেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বোচ্চ পুরস্কার অস্কার লাভ করেন ১৯৯২ খ্রিঃ। ১৯৯২ খ্রিঃ ২৩ শে এপ্রিল সন্ধ্যায় ৭১ বছর বয়সে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় কলকাতার 'বেলভিউ নার্সিংহোম'এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৩১০.৪.১৪.৩ : সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্যচর্চা

বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে অধিক পরিচিত, প্রশংসিত ও সম্মানিত হলেও সত্যজিৎ রায়ের অভিনব সাহিত্যচর্চা বাংলা ও বাঙালি তথা বিশ্ববাসীর হৃদয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর এমন আন্তর্জাতিক মানের বহুমুখী প্রতিভা বিরল। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গণে তাঁর পদচারণা যেন তাঁর খ্যাতিমান পূর্বজদের অর্থাৎ দাদু উপেন্দ্রকিশোর ও পিতা সুকুমার রায়ের যথার্থ উত্তরসূরি হিসেবে। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের যখন অন্তিম পর্ব চলছিল, ঠিক তখনই তাঁর হাত দিয়ে আবির্ভাব হয়েছিল 'ফেলুদা'র। তিন বয়সের, তিন আলাদা চরিত্র মিলে ফেলুদার মতো মাণিক্য গোটা বিশ্বে অমিল।ফেলুদা তার মগজাস্ত্রর জোরে বিভিন্ন রকম কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যার ও রহস্যের সমাধান করে দিতে পারে। বিখ্যাত 'ফেলুদা'র গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম হল— শেয়াল দেবতারহস্য (১৯৭০), সোনার কেল্লা (১৯৭১), কৈলাসে কেলেঙ্কারী (১৯৭৩), জয় বাবা ফেলুনাথ (১৯৭৫), গোরস্থানে সাবধান (১৯৭৭), টিনটোরেটার যীশু (১৯৮২) প্রভৃতি।

আগেই বলেছি, সত্যজিৎ রায়ের ছোটগল্পগুলি যেকোনো বয়সের মানুষের মনকে আকর্ষণ করে আজও। খুবই সহজ সরল ভাষায় লিখেছেন সেসব ছোটগল্প। সত্যজিৎ রায়ের কয়েকটি বিখ্যাত ছোটগল্প হল- তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ (১৯৮৫), একের পিঠে দুই (১৯৮৮), পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য (১৯৮৬), সুজন হরবোলা (১৯৮৭) ইত্যাদি।

সত্যি বলতে কি, সব ছাড়িয়ে কল্পবিজ্ঞানে তার রচিত "ফেলুদা" কিংবা ''প্রোফেসর শঙ্কু'র মতো কাল্পনিক চরিত্রগুলো আজও বাংলার তরুণ সমাজের হৃদয়ে চির ভাস্বর। তিনি এই তিনটি চরিত্র ছড়াও অনেক ছোট উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও অনুবাদকর্ম রচনা করেছেন। লেখার মূল লক্ষ্য ছিল কিশোর তরুণ পাঠক বর্গ হলেও তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে প্রিয় লেখক ছিলেন।

৩১০.৪.১৪.৪ : পিকুর ডায়রি গল্পের সারমর্ম

সত্যজিৎ রায়ের 'পিকুর ডাইরি' গল্পটি শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৩৭৭ সনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গল্পটি 'পিকুর ডাইরি ও অন্যান্য' এই নামের গল্পসংকলনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯৮৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি সত্যজিৎ রায়ের অষ্টম গল্প সংকলন। এই সংকলনে আছে চারটি গল্প এবং দুটি চিত্রনাট্য; যথাক্রমে - পিকুর ডায়রি, আর্যশেখরের জন্ম ও মৃত্যু, ময়ূরকণ্ঠি জেলি, সবুজ মানুষ এবং পিকু ও শাখাপ্রশাখা। আমাদের আলোচ্য 'পিকুর ডায়রি' গল্পটি এই সংকলনের প্রথম গল্প। গল্পটি পিকু নামে একটি ছয় বছর বয়সী বালকের দিনযাপনের স্বরচিত কাহিনি। দিনলিপিকে আঁকড়ে ধরে সে প্রতিদিনের অব্যক্ত কথাগুলিকে ব্যক্ত করে ডাইরির পাতায়। গল্পটির শুরু থেকেই অত্যন্ত আড়াল এবং গোপনীয়তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ গল্পটি আসলে একটি ডাইরির পাতা, যেটা কিনা একটি ছয় বছরের শিশুর মনের গোপন কথা। কাঙ্ক্ষিত স্নেহের বাতাবরণের বিপ্রতীপ আবহাওয়া কিভাবে তার শিশুমনে আঘাত করছে সেটাই গল্পের বক্তব্য বিষয়। এর পাশাপাশি একটি শিশুর চোখ দিয়ে দেখা উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের ভিতরকার ক্ষয় ও হাহাকারের একটি অসাধারণ প্রতিচ্ছবিও এই গল্পের মধ্যে উঠে এসেছে। পশ্চিমা আদলে গড়া নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতাকে সত্যজিৎ রায় ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন এবং গল্পে তাকে শিশু মনস্তত্ত্বের নিখুঁত দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

৩১০.৪.১৪.৫ : গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

একটি শিশুমনের জানালায় উঁকি দিয়ে লেখক আধো-আধো অস্ফুটবুলি দিয়ে নির্মাণ করেছেন এ গল্পের কাঠামো। গল্পের মধ্যে পিকু নামের একটি ছয় বছরের বালকের দিনলিপির পাতা থেকে তৈরি করেছেন এ গল্পের অবয়ব। কলকাতার তৎকালীন উচ্চবিত্ত বাঙালি সমাজের তথা পরিবারের ক্ষয়িষ্ণুতার বাস্তব চিত্র এ গল্পের আভ্যন্তরীণ নির্যাস। আপাতঅর্থে যা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বিষয় কিন্তু গল্পের কথক একটি শিশু। তার বয়ানেই ব্যক্ত হয়েছে গল্পের কাহিনি।

গল্পটি একটি শিশুর স্বরচিত কথনভঙ্গিতে শুরু হয়েছে এভাবে 'আমি ডাইরি লিখছি। আমি আমার নীল নতুন নীল খাতায় ডাইরি লিখছি।' বাড়িতে মা-বাবা-দাদা-দাদু সকলেই আছে কিন্তু এই শিশুটিকে সঙ্গ দেওয়ার কেউ নেই। সে একা নিঃসঙ্গ। বাড়িতে দাদুর অসুখ, মা, বাবা, দাদা সকলেই ব্যস্ত। অন্যদিকে স্কুল পড়ুয়া এই বালকটির স্কুলও স্ট্রাইকের জন্য নিত্যদিন বন্ধ। ফলে শৈশবের হুল্লোড় থেকেও সে বঞ্চিত। অন্যদিকে মাতৃস্নেহের স্বাভাবিক আচ্ছাদন থেকেও সে নির্বাসিত, অবহেলিত। শুধু রকমারি খেলনা কিংবা মনভোলানো কয়েকটা জিনিস দিয়ে নিজের থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে তার মা। এই বস্তুগত আতিশয্যে শিশুমনও বিভ্রান্ত 'আজকাল মা খুব জিনিস দেয়'এই ভাবনায়। শিশু চায় মায়ের কোল, জিনিস দিয়ে সেটা কখনোই পূরণ হয় না। সেটা ছয় বছরের শিশু মনেও রেখাপাত করে। বাড়ির পরিচারক- পরিচারিকার দ্বারা বেড়ে ওঠা পিকুর শৈশবের এই আল্‌গা দিকটা বারাবার চোখে পড়ে আমাদের।

মা এর সঙ্গে অন্য পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা সে বুঝতে না পারলেও মা-বাবার স্বাভাবিক সম্পর্কের ছন্দপতন পিকুর চোখ এড়ায় না, এয়ারগান কিনে আনা নিয়ে মা এর সঙ্গে বাবার তর্কাতর্কি কিংবা হিতেসকাকুর সঙ্গে মা এর যখন-তখন বাইরে যাওয়া সবকিছুই এই ছোট্ট শিশু মনকে উত্তাল করে। অবুঝ মনে ভেসে ওঠে মা এর কাল্পনিক চরিত্র, যেখানে মা মানে 'খুব তাড়াতাড়ি ঠিক সিনেমার মতো।' অর্থাৎ তার নাগালের বাইরে।

এদিকে বাবাও অফিস থেকে সন্ধিৎসু মনে ফোনে মা এর খোঁজ নেয় অথচ ছোট্ট শিশুটির কোনো খবর নেয়না। বাবার 'কড়াক' করে ফোন কেটে দেওয়া কিংবা দাদার রাত করে বাড়ি ফেরা, বাবার চিৎকার চেঁচামেচি, এসব কিছু শিশুটি অপলক দৃষ্টিতে দেখে। সে ছটফট করে মুক্তি খোঁজে জানালার ধারে আসা চড়াইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়ে, কখনোবা স্বপ্নে টগবগ করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে দাদুর সাথে ভিক্টোরিয়া ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। আসলেশৈশব মানে শুধু আর্থিক স্বাছন্দ্যের কারণে ভালো-মন্দ খাবার কিংবা রকমারি খেলনার শখপূরণ নয়; শৈশব মানে পিতা-মাতার অপরিসীম স্নেহ-যত্নের দ্বারা লালিত হওয়া একটা বয়সসীমা। শিশু মনস্তত্ত্বের এই সূক্ষ্মদিকটিকে গল্পকার আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পিকুর ডাইরির পাতায় এবার আমরা দেখি কলকাতার সেই বড়লোক বাঙালি বাড়ির জমায়েত অনুষ্ঠান, সাহেবি নাম 'পার্টি'। বাড়ির সবথেকে কনিষ্ঠ সদস্য হলেও তার বিষয়টি খুব অদ্ভুত লাগে কারণ পিকু ভাবে 'আমার জন্মদিন না কিন্তু এমনি পারটি। সবাই খালি বড়রা তাই আমি যাইনি খালি মাঝে মাঝে একটু খালি দেখছিলাম। খালি বাবার বন্ধু ও আর মার বন্ধু'। ভাবা যায়! বাড়ির অনুষ্ঠান অথচ শিশুটির কোনো ভূমিকা নেই। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে এককোণে দাড়িয়ে। এর থেকে বড় আঘাত আর কী হতে পারে! নিঃশব্দের ক্রন্দন একসময় শিশুমনের খামখেয়ালিতে উবে যায় কিন্তু মনের ডায়রিতে আঙুলের ছাপ রেখে যায়। আন্দোৎসবের এই সাহেবিয়ানা বাঙালিকে কিভাবে ভিতরে ভিতরে ক্ষয়িষ্ণু করে তুলেছিল তার দৃষ্টান্ত এই 'পারটি'।

এরপর আমরা দেখব পিকু ও তার মা এর সহজ কথোপকথনে এসে পড়া হিতেসকাকুর ভূমিকা।মা এর চরিত্র বদল হয়। ক্রুদ্ধ মা এর দেওয়া আঘাতে শিশুর মনে এবং শরীরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ধরা দেয় মাতৃত্বের সহজ স্নেহের পরিবর্তে লালসারূপী পিশাচীর ক্রূরতা। শিশুসুলভ চিৎকার চেঁচামেচি করা তার অভ্যাস নেই কারণ সে জানে তাকে চোখের জল মুছিয়ে স্নেহক্রোড়ে নেওয়ারও কেউ নেই। অবোধ শিশুর ব্যথার ভাষায় চৈতন্য ফিরে পাক বড়রা এমনটাই হয়ত চেয়েছিলেন গল্পকার স্বয়ং। এভাবেই বড্ড আগলহীন জীবনে সম্পর্কের অগভীর শিকড়গুলোর প্রতি সীমাহীন বৈরাগ্যের বয়ানই উঠে এসেছে পিকুর ডায়রির পাতায়।

নিঃসঙ্গতা কিভাবে একটি পরিবারকে গ্রাস করে নিশ্চিহ্ন করতে পারে, সেটাই পিকুর ডায়রির শেষ পাতা অর্থাৎ গল্পের শেষে প্রকাশিত। একদিকে বাড়ির বড় ছেলে অর্থাৎ পিকুর দাদা প্রায় নিখোঁজ অথচ মা-বাবা দিনরাত চিৎকার চেঁচামেচি করে নিজেদের ইগো নিয়ে অন্যদিকে বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ (দাদু) সদস্যঅসুস্থ। এই আটপৌরে সম্পর্কের মানুষগুলোকে পিকুর বড্ড অচেনা এবং সুদূরের মনে হয়। তাই তার সবসময়

একা লাগে। অস্ফুট বেদনার্ত স্বরে সে বলে ওঠে 'কেউ নেই খালি আমি আর দাদু আর একটা খালি মাছি আছে'। এরপর খাতার পাতা শেষ হয়ে যায়। এভাবেই পিকুর দিনলিপিতে উঠে এসেছে এক- একটা দৃশ্য ও এক-একটা মুহূর্তের ছবি, যেগুলো সব একসাথে একটা অস্থির সময়ের বর্ণনা। হয়তো দৃশ্যগুলোর বিবরণ সূক্ষ্ম নয় কারণ ব্যাকরণহীন, খাপছাড়া, আনমনা ভঙ্গিতে লেখা এ গল্পের কথক একটি ছয় বছরের শিশু যে সেইসময়ের সমস্ত শিশুমনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গল্পের লেখকের এই অপ্রত্যক্ষ নৈর্বক্তিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি আমাদের চোখ এড়ায় না। এটাই এই গল্পের মূল আকর্ষণ।

৩১০.৪.১৪.৬ : গল্পের শৈলীবিচার

ডায়েরি ব্যক্তি বিশেষের। কর্মক্লান্ত মনের অনুরণিত ধ্বনিই এর বর্ণিতব্য বিষয়। প্রতিদিন বা কয়েকদিন অন্তর তিক্ত ও মধুর অভিজ্ঞতাই এর মূল বিষয়। লেখক আপন মনে ডায়রি রচনা করে আত্মার সন্তুষ্টি বিধান করে। আমাদের আলোচ্য গল্পের নাম 'পিকুর ডায়রি'। এখানে উল্লেখ্য 'পিকু' একটি কাল্পনিক চরিত্র। তাই গল্পের কথকও কাল্পনিক, বাস্তব কোনো ব্যক্তিসত্তা নয়। বলা ভালো লেখক গল্পের প্লটে এইভাবে অভিনব শৈলীর প্রয়োগ করেছেন। গল্পটি পড়লে মনে হবে যেনো একটা গোটা ডায়রি। যেমন ডায়রির একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তথ্য প্রাধান্য। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জীবনচর্যার তালিকা প্রকাশই এর বিশেষ প্রবণতা, কী পেলাম এবং কী হারালাম এমন একটি হিসাব-নিকাশই ডায়েরির মুখ্য বিষয়। আলোচ্য গল্পেও পিকু তার সারাদিনে মনের কথাই ডায়রির মধ্যে লিখে রেখে। তার ডায়রির পাতা থেকেই আমরা পরিচিত হই তার পরিবারের সঙ্গে মা, বাবা, দাদা, দাদু প্রমুখ সদস্যদের সঙ্গে। জানতে পারি তার একাকীত্বের যন্ত্রণার কথা। মুখোমুখি হই শৈশবের কিছু অব্যক্ত অনুভূতির সাথে। গল্পের প্লট বদল হয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে, শিশুর খামখেয়ালি মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে। গল্পের সমাপ্তিটাও অভিনব, সরাসারি দাদুর মৃত্যুর খবর না বলে অদ্ভুত ব্যঞ্জনায় জানিয়ে দিলেন এইভাবে 'দাদু শুয়ে আছে আর কিন্তু ঘুমোচ্ছে না তাই বল্লাম দাদু কি বেপার কিন্তু দাদু কিন্তু কিছু বল্লনা খালি উপরের দিকেই দেখছে পাখাটার উসা ফ্যানটার দিকে' এতে পাঠকের চিন্তনশক্তিকে দিলেন স্বাধীনতা। অন্যদিকে মা এর অনুপস্থিতিটাও পাঠককে চাপা টেনশনে রাখে শেষ পর্যন্ত কারণ পিকুর ডায়রির 'পাতা শেস, খাতা শেস, বাস শেস'। এইভাবেই গল্পের অবাক করা সমাপ্তি টেনেছেন লেখক, যা সত্যিই বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

এবার আসি গল্পের চরিত্রের চরিত্রায়নের বিষয়ে। লেখক সাধারণত এ ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেন। এক সরাসরি চরিত্রের কথা বলা আর একটি হলো চরিত্রের ভাবনা, উপলব্ধি, স্বপ্ন-সাধ, আশা-হতাশা, অভ্যাস ইত্যাদিকে তুলে ধরা। আলোচ্য গল্পটি দ্বিতীয় গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। গল্পের কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র পিকু। সমগ্র কাহিনিতে পিকুই প্রথম এবং শেষ কথা বলেছে। পিকুর ভাবনায় উপলব্ধ গল্পের অন্যান্য চরিত্রগুলির চরিত্রায়ন। পিকু একটি ছয় বছরের ছোট্ট শিশু।তার শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েও লেখক তৎকালীন কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

গল্পের বিষয় বলতে আমরা যা বুঝি, সেই গতানুগতিকতার পথ ছেড়ে লেখক এই গল্পের বিষয়েও এনেছেন বৈচিত্র্য। এখানে কথক শিশু কিন্তু বক্তব্য বড়দের বিষয়। এককথায় শিশুর চোখে বড়দেরকে দেখার ভাবনায় তৈরি এ গল্পের আখ্যানের অবয়ব। মা-এর সঙ্গে হিতেশকাকুর অবৈধ ব্যভিচারের পিকুর বিশ্বাসের নিষ্পাপ পৃথিবী যেন মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পিকু দেখে রাতে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়ার উত্তাপ, তারমধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী দাদুর পুত্রের সংসারে অবাঞ্ছিত হয়ে অস্তিত্বের অপমান, অন্যদিকে বাবা বেরিয়ে গেলে মা-এর প্রেমিক হিতেশকাকুর প্রাত্যহিক গোপন অভিসার। এই আবিষ্কার তার শৈশবের সারল্যকে দুমড়েমুচড়ে থেঁতলে দেয়। আর্তনাদ করে ওঠে শিশুহৃদয় কিন্তু ক্রন্দনের রোল ওঠে না। এটাই ব্যথা! যেটা কেউ টের পায়না।শুধু ডায়রির পাতায় পাতায় তার যন্ত্রণা, মানসিক অস্থিরতার অভিব্যক্তির প্রকাশ পায়। এই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ গল্পের আখ্যানশৈলীকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। বিষয়গত দিক থেকে সচরাচর যেখানে শিশুদের প্রবেশ নিষেধ সেখানেই অবাধ বিচরণ করিয়ে, তিনি সাহিত্যে আনলেন এক অভিনব বন্ধনমুক্তির স্বাদ। গল্পের নামকরণেও আছে চমক। 'পিকুর ডায়রি' নামকরণে পাঠকের প্রথম থেকেই একটা কৌতূহল থাকে পিকু কে? তার ডায়রিতেই বা কী এমন মহার্ঘ্য বস্তু আছে যা একটা গল্পের উপকরণ হতে পারে। আমরা জানি দিনলিপির বস্তুগত উপাদান যখন ব্যক্তি জীবনের রসময় অভিব্যক্তির আভাসে মুখর হয়ে ওঠে, তখন তা সাহিত্য পদবাচ্য হয়। এই রসময়তা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক কিংবা সাহিত্যিক বিষয়ে হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে রচয়িতার দৃষ্টি শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে কল্পনা প্রবণ মনন সম্পৃক্ত হতে পারে। আমাদের আলোচ্য গল্পে বিষয়টি অন্যরকম এখানে লেখক কাল্পনিক চরিত্রের মনোগত অভিব্যক্তির প্রকাশের মাধ্যম রূপে ডায়রিকে নির্বাচন করেছেন। ফলে ডায়রির এখানে স্বধর্ম অমিল কিন্তু লেখকের কল্পনায় সে সজীব হয়ে উঠছে। শিল্পীমন কত তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়কে কল্পনার বর্ণালী সমারোহে অসাধারণ করে তুলতে পারেন আলোচ্য গল্পটি তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

৩১০.৪.১৪.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গল্পের বিষয়বস্তুতে গল্পকার কিভাবে শিশু মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন, তা বুঝিয়ে বলো।

২। 'পিকুর ডায়রি' গল্পের পিকু চরিত্রের ভূমিকা লেখো।

৩। আলোচ্য গল্পের আঙ্গিকের অভিনবত্বে গল্পটির মূল বিষয়বস্তু আলোচনা করো।

৪। গল্পটিতে প্রকাশিত তৎকালীন কলকাতার উচ্চবিত্ত বাঙালি পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু দিকটি কিভাবে একটি শিশু মনকে প্রভাবিত করেছে — তা বিশ্লেষণ করো।

৫। গল্পটিকে কি ডায়রিধর্মী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

৩১০.৪.১৪.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। পিকুর ডায়রি ও অন্যান্য — সত্যজিৎ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স।

২। জীবন শিল্পী সত্যজিৎ রায় — দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, হরফ প্রকাশনী।

৩। লেখক সত্যজিৎ রায় — শ্যামল কান্তি দাশ, শিবরাণী প্রকাশনী।

৪। বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায় — সুখেন বিশ্বাস, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস।

৫। সত্যজিৎ রায় — বিশ্বজয়ী প্রতিভার বর্ণময় জীবন — অরূপ মুখোপাধ্যায়, দীপ প্রকাশন।

একক - ১৫

দ্রৌপদী

মহাশ্বেতা দেবী

বিন্যাসক্রম

৩১০.৪.১৫.১ : ভূমিকা

৩১০.৪.১৫.২ : মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম

৩১০.৪.১৫.৩ : দ্রৌপদী গল্পের উৎস সূত্র

৩১০.৪.১৫.৪ : গল্পের প্রেক্ষাপট

৩১০.৪.১৫.৫ : গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

৩১০.৪.১৫.৬ : নামকরণ

৩১০.৪.১৫.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৪.১৫.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩১০.৪.১৫.১ : ভূমিকা

মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬, ১৪ই জানুয়ারি — ২০১৬, ২৮শে জুলাই) বাংলা সাহিত্যের একজন স্বতন্ত্র ঘরাণার লেখক। তাঁর লেখায় বহুমাত্রিক অনুষঙ্গে দেশজ আখ্যান উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি একজন অনুসন্ধানী লেখক। এক অর্থে মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের নব অভিভাবিকা। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ইতিহাসের অনেক উপেক্ষিত নায়কদেরকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের ইতিবৃত্তে একটি বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তথা ডোম, লোধা, শবর বিভিন্ন জনজাতির কথা। তাদের পরিবেশ, পরিস্থিতি, যাপনচিত্র তাঁর কলমে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বাক্ষর রেখেছে। কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষভাবে তাদের সংগ্রামে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজে চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করেছেন। বিশেষত আদিবাসী নারীচরিত্রেরা তাঁর কলমে অনন্য হয়ে উঠেছে, বুদ্ধিতে সাহসে প্রেমে ও প্রতিবাদে তারা একের পর এক নির্মিত হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর রচনায়। উপজাতিদের, বিশেষত নারীদের

বঞ্চনা ও বিপন্নতার কথাই প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পগুলিতে।আমাদের আলোচ্য গল্প 'দ্রৌপদী'তে সভ্য সমাজের আদিবাসীদের প্রতি শোষণ এবং সেই শোষণের প্রতি বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। এই গল্পে দ্রৌপদী নামক আদিবাসী নারী-চরিত্রে উলঙ্গ ও সোচ্চার প্রতিবাদ তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর শাণিত উচ্চারণে। চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলে বলে, 'হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করবো কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি?' এই প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করা যায়, লালসা চরিতার্থ করা যায়, কিন্তু সম্মান দেওয়া যায় না। অথচ এই গল্পের শেষে সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে। এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এইভাবেই জেগে উঠুক, কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য সম্মান।"

এর আগে অনেক সমাজ সচেতক সাহিত্যসাধককে আমরা সাহিত্য রচনা করতে দেখেছি। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো সমাজ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী যেভাবে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ — দুঃখ, আশা — নিরাশা, বেদনা — উল্লাসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন অন্যদের ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায়নি।

৩১০.৪.১৫.২ : মহাশ্বেতা দেবীর জীবন ও সাহিত্যকর্ম

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৪ জানুয়ারি ১৯২৬ সালে ঢাকায়। তাঁর পিতা মনীশ ঘটক ছিলেন 'কল্লোল যুগে'র প্রখ্যাত সাহিত্যিক। মা ধরিত্রী দেবী, স্কুল কলেজে লেখাপড়া না করলেও তিনি লেখাপড়ার অনুরাগী ছিলেন। তাঁর কাকা ছিলেন ভারতের চলচ্চিত্রের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার অধিকারী বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক। শিল্প সাহিত্যের এরকম ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবারে তিনি বড় হন। তাঁর লেখাপড়ার সূত্রপাত হয় ঢাকার ইডেন স্কুলের মন্তেসরিতে। পরবর্তীকালে তিনি চতুর্থ শ্রেণিতে মেদিনীপুরে। মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁকে ভর্তি করা হয় শান্তিনিকেতনে। তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন। মহাশ্বেতা দেবী পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে পড়শোনা করেন। পিতার বদলীর চাকুরীর কারণে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসে বেলতলা গালর্স স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয়। তিনি সেখান থেকে ম্যাট্রিক এবং আশুতোষ কলেজে থেকে ইংলিশে অনার্স পাশ করেন। পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে তিনি এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

মহাশ্বেতা দেবী ১৯৩৯ সালে অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালে খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'রং মশাল' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত 'ছেলেবেলা' শিরোনামে তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি আশুতোষ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী থাকাকালে কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন 'গালর্স স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর হয়ে দুর্ভিক্ষকালীন ত্রাণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হয়েও পার্টির কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, সেই সময় থেকেই তাঁর কর্মী সত্তার বিকাশ ঘটে।

১৯৪৭ সালে খ্যাতিমান নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের বিবাহিত জীবন ছিল দারিদ্র ক্লিষ্ট। ১৯৪৮ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র নরারুণের জন্ম হয়। তাদের বিবাহিত

জীবন পনেরো বছরের বেশি স্থায়ী না হলেও মহাশ্বেতা দেবী কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এ কথার মাধ্যমে Bijan has shaped my talent and given it permanent form. He has made me into what I am today. তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত বিয়ের পর থেকে। তিনি এক সময় সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে 'সচিত্র ভারত পত্রিকা'য় ফিচার ও গল্প লিখতে শুরু করেন। তিনি ইতিহাস খ্যাত বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রাণী উপর লেখালেখি আরম্ভ করেন। 'দেশ' পত্রিকায় তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'ঝাঁসির রাণী' ১৯৫৬ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তাঁকে আর থামতে হয়নি। তিনি লেখালেখিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন।

তাঁর প্রথম পর্বের লেখালেখি প্রসঙ্গে বলতে হয় তিনি গল্প-উপন্যাসে ইতিহাসের আলোকে রাজনীতি, অর্থনীতির সাথে সাথে লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবন ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি 'নটী' (১৯৫৬) উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচনা করেন খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে। তিনি লোকায়ত নৃত্যগীতির আলোকে রচনা করেন ১৯৫৮ সালে 'মধুরে মধুরে' উপন্যাস। ১৯৫৯ সালে লেখা 'প্রেমতারা' উপন্যাসটি রচনা করেন সার্কাসের শিল্পীদের বিচিত্র জীবনের আলোকে। এ পর্বে তিনি বিশেষ আঙ্গিকে 'যমুনা কী তীর' (১৯৫৮), 'তিমির লগন' (১৯৫৯) 'রূপরেখা' (১৯৬০), 'বায়োস্কোপের বাক্স' (১৯৬৪) ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে মহাশ্বেতা দেবী যে সব উপন্যাস রচনা করেন সেগুলোকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যকর্ম বলা যেতে পারে। এ পর্বে তিনি রাজনৈতিক চেতনায় ঋদ্ধ ইতিহাস নির্ভর কহিনীর আলোকে ব্যতিক্রমধর্মী বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে 'আঁধার মানিক' (১৯৬৬), 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) ইত্যাদি।

মহাশ্বেতা দেবীর তৃতীয় পর্বের সাহিত্য কর্মে অন্ত্যজ শ্রেণির দলিত মানুষের ইতিহাস, যাপিত জীবন ও দলিত হওয়ার কাহিনি তুলে ধরেছেন। এ পর্বের উপন্যাস যেমন, 'হাজার চুরাশীর মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৫) 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮০), 'বিরসা মুন্ডা' (১৯৮১), 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮২) 'সুরজ গাগরাই' (১৯৮৩), 'ক্ষুধা' (১৯৯২), কৈবর্ত খন্ড (১৯৯২), 'মার্ডারারের মা' (১৯৯২) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যসগুলো ছাড়াও আদিবাসীদের ওপর আরো কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংকলনগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) ইত্যাদি। এ সব গল্প উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ও এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শোষণের চিত্রের সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন।

সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশক আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের পক্ষে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখেন। ১৯৯২ সালে মহাশ্বেতা দেবী জেনেভা মহিলা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে তিনি ভারতবর্ষের কৃষক সমাজকে দলিত আদিবাসী ও উপজাতিদের মতোই অসহায় বলে উপস্থাপন করেন।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যকর্ম ইংরেজি, জার্মান, জাপনি, ফরাসি এবং ইতালীয় ভাষার অনূদিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর অনেক সাহিত্যকর্ম ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার মধ্যে হিন্দি, অসমীয়া, তেলেগু, গুজরাটি, মারাঠী, মালয়ালম, পাঞ্জাবী, ওড়িয়া এবং আদিবাসী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্যে নানা পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি ১৯৭৯ সালে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের জন্যে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তিনি লাভ করেন ভুবনমোহিনী দেবী পদক, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য স্বর্ণপদক এবং ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পদক পান। এছাড়া জগত্তারিণী পুরস্কার, বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার লাভ করেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত লীলা পুরস্কারও লাভ করেন। তিনি ১৯৯৭ সালে ম্যাগসাসাই পুরস্কার পান আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করার জন্যে। ১৯৯৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট প্রদান করে। ২০০১ সালে ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মান লাভ করেন। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এই মহান সাহিত্যপ্রতিভার জীবনাবসান হয়।

৩১০.৪.১৫.৩ : দ্রৌপদী গল্পের উৎস সূত্র

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয়া ১৯৭৭ সালে।পরে গল্পটি 'অগ্নিগর্ভ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পগ্রন্থে মোট চারটি গল্প আছে, যথা— 'অপারেশন? বসাই টুডু', ''দ্রৌপদী', 'জল' এবং 'এম. ডব্লু. বনাম লখিন্দ'। 'দ্রৌপদী' (১৯৭৭) রচনার মধ্য দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী এক অবিস্মরণীয় আদিবাসী নকশাল নারীচরিত্র গড়ে তোলেন। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে এবং একই সঙ্গেআদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা ও সংস্কার এবং গৌরবের প্রান্ত কাহিনি-সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নারীর চিরন্তন দুর্বলতা নগ্নতাকে শক্তি হিসেবে, বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এ-গল্পে। বিষয়বিন্যাসে, ভাষার সূক্ষ্ম বয়নে এবং এক্সপ্রেশনে 'দ্রৌপদী' সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার।

৩১০.৪.১৫.৪ : গল্পের প্রেক্ষাপট

মহাশ্বেতা দেবীর অগ্নিগর্ভ কলমে জন্ম নেয় এ যুগের দ্রৌপদী, নাম দোপ্‌দী মেঝেন। ১৯৭১-এর পশ্চিমবঙ্গ হল 'দ্রৌপদী' গল্পের প্রেক্ষাপট। ১৯৬৭ সালের মে মাসে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল থেকে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালের নেতৃত্বে যারা সেদিন গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করেছিল, তাদের অধিকাংশই আদিবাসী ভূমিহীন চাষী। বছরের পর বছর স্থানীয় জোতদারদের শোষণে নিষ্পেষিত লেপচা, ভুটিয়া, সাঁওতাল, ওরাও, রাজবংশী প্রমুখ আদিবাসী নিম্নবর্গের এই সর্বহারা মানুষগুলো একত্রিত হয়ে উদাসীন সরকার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের সংকল্প নেয়। পাশে ছিল তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত ছাত্রসমাজের একটা বিশাল দল। নকশালবাড়ির এই অভ্যুত্থানকে মহাশ্বেতা দেবী কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে না দেখে, এটিকে ইতিহাসের কালপর্বে অনিবার্য রূপে বিশ্বাস করেছেন। তাঁর বিশ্বাসের অনুরণন ঘটেছে তাঁর বিদ্রোহী কলমে।

আমাদের আলোচ্য গল্পের মুখ্য চরিত্র দোপ্‌দী এবং দুলন মেঝেন ছিল সেই আন্দোলনের-ই অংশ। যাঁদের নাম জড়িয়েছিল সে এলাকার দাপুটে জমিদার, সূর্য সাহু খুনের মামলায়। এ গল্পকে মহাশ্বতা দেবী শুধু দুই গেরিলা যোদ্ধা দম্পতির জীবনযাপন এবং রোমহর্ষক বীরত্বের কাহিনিতে আটকে না রেখে, বিষয়বস্তুকে আরও খানিকটা বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দ্রৌপদী গল্পে বারবার উঠে আসছে সমাজের বাবু শ্রেণি বনাম নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ। তাদের মধ্যেকার শ্রেণি সংগ্রাম। যে দেশের সংবিধান অনুযায়ী সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে সমমর্যাদা দেওয়ার কথা, সে দেশে দোপ্‌দীদের মতো হাজার হাজার সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা সরকারের 'বাবু'-'বিবি'রা বোঝেন না, বুঝতেও চান না। বরং খানিক অবজ্ঞার ছলে, মশকরার ছলে তাতে ফুৎকার করেন।দেশের তথাকথিত বাবুগণের এই করুণ দশা আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন এভাবে

এই 'মা-হো' শব্দটির মানে কী? এটি কি আদিবাসী ভাষায় উগ্রপন্থী স্লোগান? এর মানে কী তা ভেবে শান্তিরক্ষক দপ্তর বহু চিন্তা করেও হালে পানি পান না। আদিবাসী বিশেষজ্ঞ দুই মক্কেলকে কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনা হয় এবং তাঁরা হফম্যান জেফার, গোল্ডডেন পামার প্রমুখ মহাশয় রচিত অভিধানে গলদঘর্ম হতে থাকেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই বাবু-বিবিদের ৮০-৯০ ভাগ অংশই উচ্চবর্গের। ফলত, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই যে বাবু-সংস্কৃতির দাপট তা কিন্তু এককথায় প্রশাসনে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতির আধিপত্যকেই বোঝায়। যেকারণে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী তথা মানুষের কাছে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি হিব্রু সমান। এই জনগোষ্ঠীর মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই উচ্চবর্ণের ভাষা। অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকতে থাকা এই আদিম জনজাতির ভাষা-সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য লেখিকার ব্যক্তিজীবনের আমরণ লড়াইয়ের একটা প্রতিচ্ছবি এই গল্পের এই অংশে প্রতিফলিত। এই সংকট দীর্ঘদিনের আর এর লড়াইও অসম। সেটাই বোঝানো হয়েছে'দ্রৌপদী' গল্পে। সভ্যতার অগ্রগতির নাম করে যে কায়দায় বাবুদের বাংলা হোক বা হিন্দি-ইংরেজি, ক্রমাগত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে আদিম কিংবা প্রান্তিকজনগোষ্ঠীর ভাষার উপরে। এর ফলেবহু জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, গোন্ডির মতো বহু ভাষার লিপিই তৈরি হয়নি তারা হারিয়ে গেছে। আর এখানেই 'দ্রৌপদী'-র প্রাসঙ্গিকতা। দোপ্‌দি আসলে এই পার্থক্যগুলোকেই চিহ্নিত করে। প্রশাসনিক বাবুদের দোপ্‌দীদের মতো 'ভয়ানক' নকশালদের নিয়ে যে আতঙ্ক, খেয়াল করলে দেখব, তার অনেকটাই জড়িয়ে রয়েছে দোপ্‌দীদের ভাষার সঙ্গে, তার ভাষা না বুঝতে পারার সঙ্গে। এই অজ্ঞতার কাঠপিঁপড়ের হুল ফুটিয়ে গল্পকার বিদ্রুপের বর্শা ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করেন কেতাবি বাবুদের — "একজন আদিবাসী বিশেষজ্ঞ আর্কিমিডিসের মত ন্যাংটো ও শুভ্র আনন্দে ছুটে এসে বলে ওঠেন, 'সার! ওই হেন্‌দে রামব্রা কথাগুলোর মানে বের করে ফেলেছি। ওগুলো মুণ্ডারি ল্যাংগোয়েজ।"

৩১০.৪.১৫.৫ : গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ

লেখিকার কণ্ঠের প্রতিবাদের সোচ্চার গল্পের মূল চরিত্র দোপ্‌দির রক্তিম স্বরে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। বিপদ যত আসন্ন হয়েছে বিদ্রোহের স্বর ততই বজ্রগর্ভ হয়েছে। কখনো তাচ্ছিল্যে, কখনো চোখে ধূলো

দিয়ে, কখনোবা আত্মগুপ্তির অভিনবত্বে বারংবার সাফল্য অর্জন করে চ্যালেঞ্জ করেছে সরকারি বাবুদের কেতাবিবুদ্ধির অহংকারকে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের কাছে 'ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোঁড়া। সিদ্ধ মলমে সারবার নয়, তোকমারিতে ফাটবার নয়'।

নকশালবাড়ির আন্দোলনের অভিঘাতের মোকাবিলায় রাষ্ট্র যখন নাস্তানাবুদ তখন দোপ্দী, দুলনরা এসে যোগ দেয় শিক্ষিত যুবক নকশাল কর্মীদের সঙ্গে। জঙ্গলের আদিম পরিবেশে অভ্যস্ত অবাদ বিচরণকে কাজে লাগিয়ে তারা অবতীর্ণ হয় দলের 'ক্যুরিয়র'এর ভূমিকায়। অপ্রতিরোধ্য গতিতে তারা একে একে উচ্চবর্ণের ইঁদারা, টিউবোয়েল দখল, সূর্য সাহুর হত্যা, থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ ইত্যাদি নানা কর্মের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের রোষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উগ্রপন্থায় সরাসরি সরকারের সঙ্গে শত্রুতায় সামিল। রাষ্ট্রের খাতায় নাম তোলে মোস্ট ওয়ান্টেড এর তালিকায়। রাষ্ট্রের তরফে অপারেশন বাকুলিতে এক বাঙালি প্রৌঢ় স্পেশালিস্ট সেনানায়কের নেতৃত্বে সবরকম তৎপরতার সত্ত্বেও দোপ্দি এবং দুলন্ বেঁচে পালাতে সক্ষম হয়। তারপর ঝাড়খানি বেল্টে তাদের সক্রিয়তায় যখন ক্যাপ্টেন অর্জন সিং পর্যুদস্ত, তখন সেই বাঙালি প্রৌঢ় সেনানায়কের বক্তব্যে উন্মোচিত হয়েছে রাষ্ট্রের পরিচালনার দুর্বল দিকটি

শুধু কি প্রতিপক্ষের বেলাই বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস? অর্জন সিংয়ের ক্ষমতাও তো বন্দুকের মেল অর্গান থেকে বেরোয়। হাতে বন্দুক না থাকলে এ যুগে "পঞ্চ ক' আদি বিকল ও ব্যর্থ।

প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা এই শ্রেণিদ্বন্দ্বকে কোন সমাধান ছাড়াই রাষ্ট্র যখন অসম বলপ্রয়োগে শান্তি বজায় রাখতে চায়, তখনই সূচনা হয় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির। আলোচ্য গল্পের প্রথম পর্বে আমরা দুলন্ মাঝির হত্যা প্রত্যক্ষ করি। জলপানরত অবস্থায় শিকার করে রাষ্ট্রের কর্তব্যরত অফিসাররা, ৩০৩ ধারায় তাকে গুলিবিদ্ধ করে মারা হয়। কিন্তু মৃত্যুর সময়ও সে সরকারকে শাঁসিয়ে যায় এক অজ্ঞাত ধ্বনিতে। গল্পকারের ভাষায় '৩০৩-র আঘাতে ছিটকে পড়ে যেতে যেতে সে দুহাত ছড়িয়ে ভীষণ গর্জনে 'মা-হো' বলে সফেনরক্ত উদ্‌গিরণ করে নিশ্চল হয়।' পরে জানা যায় 'মা-হো' আসলে সাঁওতালদের লড়াইয়ের ডাক। মহাশ্বেতা দেবী সর্বান্তকরণে এই সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন।

একা দোপ্দি মেঝেন এতটুকু দমে না গিয়ে তার 'ক্যারেক্টরের তেজে' আগুন লাগিয়ে দেয় রাষ্ট্রের ঘরে। সে আগুন নেভানো তো দূরের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে যায় সারা দেশ। কৃষক-শ্রমিক, ভূমিহীন, বঞ্চিত, শোষিত মানুষগুলো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তোলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপ্রতিরোধ্য ঢাল। তাই অরিজিত, শামু, মণ্টু, মালিনীদের সাথে এক সারিতে উপস্থিত হয় দোপ্দি মেঝেন্। তাদের উদ্দাম মনোভাব ও মুক্তির উদগ্র বাসনায় সরকার পক্ষের ক্ষমতার ভিত কম্পন তৈরি হয়। গল্পকারের ভাষায় উঠে এসেছে সেই অনিবার্য সত্য

ভয়ের কথা অন্যত্র। যারা আছে, তারা দীর্ঘদিন জঙ্গলের আদিম জগতে আছে। সাহচর্য করছে দরিদ্র দাওয়াল ও আদিবাসীদের সঙ্গে। এই সাহচর্যের ফলে তারা নিশ্চয়ই কেতাবি শিক্ষা ভুলে মেরে দিয়েছে। যে মাটিতে থাকছে, তার সঙ্গে হয়তো কেতাবি শিক্ষা ওরিয়েন্টেশন করে নতুন করে সংগ্রাম-পদ্ধতি ও বাঁচবার নিয়ম শিখছে। বাইরের কেতাবি শিক্ষা ও অন্তরের উদ্যম এইমাত্র যাদের সম্বল, তাদের গুলি করে নিকেশ করা চলে। হাতে কলমে কাজ করছে যারা, তারা অত সহজে নিকেশ হওয়ার নয়।

দোপ্‌দিকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয়। সেসব ফাঁদে পড়বার মতো নিরীহ যোদ্ধা সে নয়। দুর্নিবার গতিতে সমস্ত নির্যাতনকে দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার অঙ্গিকার নিয়ে সে এগিয়ে চলে তার লক্ষ্যে। আসন্ন বিপদ জেনেও সে গা ঢাকা দেয়নি বরং প্রাণ থাকতে জীবনযুদ্ধে হার না মানার লক্ষ্যে সে এগিয়ে গেছে, যতই এগিয়েছে ততই পাঠককুলকে সম্ভাব্য ভয় তাড়া করেছে। শেষপর্যন্ত 'সন্ধ্যা ছটা সাতান্নতে দৌপদী মেঝেন অ্যাপ্রিহেন্ডেড হয়'। সোমাই ও বুধনার বিশ্বাসঘাতকায় আহত দ্রৌপদী এগিয়ে যায় নির্যাতনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য

তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়। এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোকবর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে, কী বিস্ময়, আকাশ ও চাঁদকেই দেখে। ক্রমে ওর মস্তিষ্ক থেকে রক্তাভ আলপিনের মাথা সরে সরে যায়। নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু হাত দু খুঁটোয় এবং দু পা দু খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নিচে চটচটে কী যেন। ওরই রক্ত। শুধু মুখের ভেতর কাপড় নেই। ভীষণ তেষ্টা। পাছে 'জল' বলে ওঠে, সেই ভয়ে ও দাঁতে নিচের ঠোঁট চাপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?...ঘোলাটে চাঁদের আলোয় বিবর্ণ চোখ নিচের দিকে নামাতে নিজের স্তন দুটি চোখে পড়ে এবং ও বোঝে হ্যাঁ—ওকে ঠিকমত বানানো হয়েছেকতজন? চার-পাঁচ-ছয়-সাততারপর দ্রৌপদীর হুঁশছিল না।

নারীকল্যাণকামী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখোশ খসে পড়ে তাদের এই ঘৃণ্য পাশবিক লালসার দৃষ্টান্তে। কিন্তু নারী যখন দ্রৌপদী, বিশেষ করে আজকের দ্রৌপদী তখন সে লজ্জায় মুখ ঢেকে বস্ত্র প্রার্থনা করে না বরং বস্ত্র পরিহার করে শরীরে হিংস্র লালসার ক্ষত-বিক্ষত চিহ্নকে উন্মুক্ত করে সদর্পে এগিয়ে যায় সেনানায়কের দিকে এবং সশব্দে বলে 'হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার ক লেঃ কাঁউটার কর? দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।' নিরস্ত্র নারী যখন লজ্জাকে জয় করে, তখন সে মা কালী রূপে সশস্ত্র হয়ে ওঠে। ধরিত্রী ত্রস্ত হয়, কম্পিত হয় অশনি সংকেতে। আদিমকাল থেকে তাইহয়ে এসেছে। যুগের সঙ্গে রূপ বদলেছে কিন্তু নারীশক্তির দর্প এতটুকু কমেনি। আলোচ্য 'দ্রৌপদী' গল্পে মহাশ্বতা দেবী সেই নারীশক্তির বোধন করলেন সঠিক সময়ের পরিসরে নবঅবয়বে। এখানেই গল্প ও গল্পকারের ভাববিনিময় ও ঐক্য ঘটেছে।

৩১০.৪.১৫.৬ : নামকরণ

আমাদের পাঠ্য 'দ্রৌপদী' গল্পটির নামকরণের বিত্তিতে এটি চরিত্রধর্মী। গল্পের মূল চরিত্র দ্রৌপদী, ওরফে দোপ্‌দি মেঝেন এ গল্পের মূল চরিত্র। তাকে কেন্দ্র করেই গোটা গল্পের বিস্তার ও পরিধি টেনেছেন গল্পকার। এ গল্পের আদি-অন্ত সবতেই আমরা এই অকুলীন আদিবাসী দোপ্‌দি মেঝেনকেই পাই। তাকে দিয়েই লেখিকা কোনো ভূমিকা ছাড়াই গল্পের সূচনা করেছেন একেবারে অস্থির ও সংকটজনক প্রেক্ষিতকে প্লট রূপে ব্যবহার করে

নাম দোপ্‌দি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপ্‌দি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা...

পুরাণের ব্যবহারে মহাশ্বেতা দেবীর সাবলীলতা আমাদের সবসময় বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে। তিনি পুরাণকে যুগের প্রেক্ষিতে নবযুগের আবাহনে খুব তাৎপর্যময় করে তুলেছেন তার লেখনীতে। মিথকে নিয়ে ভাঙা-গড়ার এই খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য 'দ্রৌপদী' গল্পের শিরোনামেও সেই বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

দ্রৌপদী হলো মহাভারতের অন্যতম কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। দ্রৌপদীর স্বামী যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে বাজি ধরে। তার আগেই অবশ্য খেলায় বাজি ধরে সবকিছু হেরে ছিল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রেখে তাঁকেও হারায়। বিজেতা পক্ষ সবার সামনে দ্রৌপদীকে টেনেহিঁড়চে বিবস্ত্র করে। এসময় কৃষ্ণ ধর্মরূপে অবতীর্ণ হয়ে অদৃশ্য থেকে বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীকে আবৃত করতে লাগলেন। এর ফলে দ্রৌপদী সবার সামনে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

মহাশ্বেতা দেবী মহাভারতের দ্রৌপদীকে নতুন ভাবে রূপায়িত করেছেন তার গল্পে। সে হয়ে উঠেছে আদিবাসী নারী দাপদী মেঝেন।তার গল্পে দেখা যায়, পুরুষরা গল্পের নায়িকাকে নগ্ন করতে সফল হয়েছে। কারণ এ গল্পের নায়িকাকে লেখিকা তৈরি করেছেন অগ্নিকন্যা রূপে যার জন্মে কালের অগ্নিগর্ভে ঘটেছে। দেহের নিরাভরণ ও বস্ত্রহীনতার লজ্জাকে সে জয় করে মরণের বেদীতেও সাফল্যের হাসি হাসতে জানে। তাই তার তেজে ত্রস্ত হয়ে ওঠে হত্যাশালা। রক্তাক্ত নিরস্ত্র দোপ্‌দি মেঝেন চোখের সামনে তেজস্বী নারী দ্রৌপদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যাকে স্পর্শ করতে ভয় পায় সেনানায়কের রূপে উপস্থিত ধর্ষকামী পুরুষ। নারী যখন তার সর্বশক্তি দিয়ে সমহিমায় অবতীর্ণ হয়ে সংহারী মূর্তি ধারণ করে তখন সে অপ্রতিরোধ্য, মৃত্যু তার কাছে উপেক্ষিত। এ যুগের রক্তমাংসের দোপ্‌দির মধ্যে পুরাণের তেজস্বী দ্রৌপদীর তেজ সঞ্চারিত হয়েছে। তাই দোপ্‌দি মেঝেন আরও ভয়ংকর "দ্রৌপদী দুর্বোধ্য, সেনানায়কের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য এক অদম্য হাসিতে কাঁপে। হাসতে গিয়ে ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে এবং সে রক্ত হাতের চেটোতে মুছে ফেলে দ্রৌপদী কুলকুলি দেবার মত ভীষ আকাশচেরা, তীক্ষ গলায় বলে, কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"

পুরুষত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তার সামনে মরণক্ষত্রে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে এ যুগের দ্রৌপদীরা। ভয়ে সংকুচিত হয়ে ইজ্জত রক্ষায় ত্রস্ত হয়না। বরং সমাজের পুরুষতান্ত্রিক চোখরাঙানিকে বেআব্রু করার সাহস রাখে, যেমনটা করেছে দোপ্‌দি। সে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দূষিত ক্লেদাক্ত বর্জ্য কে রক্তবমি করে উগ্‌রে ফেলেছে সেনানায়কের শার্ট। যে শার্ট সরকারের কর্তৃক প্রদত্ত, তাকেই বেছে নেয় বমনপাত্র রূপে। দৃশ্যটি বীভৎসতার সঙ্গে সাহসিকতা অদম্য লড়াইয়ে হয়ে উঠেছে অনবদ্য

চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার ক লেঃ কাঁউটার কর?

এ যুদ্ধ তার নিজের ব্যক্তিগত মনন ও সৃজনশীল কর্মে ছাপ ফেলেছে। এভাবেই গল্পের নামকরণে পৌরাণিক চরিত্রটির বিস্তৃতি ও ব্যপকতা দিয়েছেন এযুগের সংকটের কালে। যা গল্প ও তার প্লটকে আরও জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তুলেছে। মহাশ্বেতা দেবী তার গল্পে শুধুমাত্র আদিবাসী নারীর দুর্দশাই তুলে ধরেননি; পাশাপাশি তিনি সমাজের জাতিভেদপ্রথা জাঁতাকলে নারীরা কীভাবে নিষ্পেষিত হয়, সারা দুনিয়া নারীকে গ্রহণ করে তার চিত্রও তুলে ধরেছেন। সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, সেই লক্ষ্যেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর কাজ করে গেছেন। তাঁর সৃষ্ট নারীরা যেমন শোষিত হয়েছে, ঠিক সেরকমই বুদ্ধিতে, সাহসে, সরব ও নীরব প্রতিবাদে স্বতন্ত্র হয়ে যাতে সমাজে বার্তা দিতে পারে, সেইদিকেই লেখকের দৃষ্টি ছিল। তাঁর গল্পের নারী চরিত্রদের মধ্যে সেই চেতনা লক্ষ্যণীয়।

৩১০.৪.১৫.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'দ্রৌপদী' গল্পটি যে সামাজিক প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো।

২। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিবাদী কণ্ঠের সোচ্চার 'দ্রৌপদী' গল্পে প্রকাশিত বিষয়টি আলোচনা করো।

৩। 'ওটি প্রশাসনের নিতম্বে দুষ্ট ফোঁড়া। সিদ্ধমলমেসারবার নয়, তোকমারিতেফাটবার নয়' উক্তিটি কার সম্পর্কে করা হয়েছে? তার চরিত্রের বিশ্লেষণ করো।

৪। 'দ্রৌপদী' গল্পের পৌরাণিক উৎসের আধারে নবনির্মাণ ঘটেছে — বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও।

৫। 'দ্রৌপদী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

৩১০.৪.১৫.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন — মহাশ্বেতা দেবী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

২। নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য — নির্মল ঘোষ, করুণা প্রকাশনী।

৩। বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ — সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি।

একক - ১৬

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিন্যাসক্রম

৩১০.৪.১৬.১ : ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

৩১০.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩১০.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৩১০.৪.১৬.১ : ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৩৪-২০১২) জন্ম আধুনিক বাংলাদেশের মাদারিপুর উপজেলায়। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি কলকাতা চলে আসেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি "কৃত্তিবাস" পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "একা এবং কয়েকজন" এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম উপন্যাস "আত্মপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল "আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি", "হঠাৎ নীরার জন্য", "রাত্রির আধারে", "শ্যামবাজার মোড়ের আড্ডা", "অর্ধেক জীবন", "অরণ্যের দিনরাত্রি", "প্রথম আলো", "সেই সময়", "পূর্ব-পশ্চিম"। শিশুসাহিত্যে ক্ষেত্রে তিনি "কাকাবাবু ও সন্তু" নামে এক জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজের রচয়িতা। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ভারতের সাহিত্য একাডেমী ও পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কিশোর একাডেমির সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একাধারে লিখে গেছেন গল্প, কবিতা, উপন্যাস। সুনীলকে আধুনিক পাঠক কবি হিসেবে চিনলেও তার অন্যতম আরেকটি পরিচয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে। গল্পকার সুনীলের দুই একটি গল্পগ্রন্থ হল "শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী", "আলোকলতার মূল" ইত্যাদি। ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমাদের চেনা দীর্ঘ উপন্যাস নিয়ে। ঔপন্যাসিক সুনীল নিয়ে যত কথা হয় তার গল্প নিয়ে তত কথা হয়না। অথচ এই কবিদের লেখা গল্প তো কবিদের লেখা গল্প নয়। জীবনানন্দের গল্প যেমনটা হয়েছিল, যেখানে কবি জীবনানন্দ থেমেছেন গদ্যকার জীবনানন্দ আরম্ভ করেছেন সেখান থেকে। গল্প লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর কবি সুনীল যেখানে একেবারেই আলাদা। তিনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যমানতাকে অনুসরণ করেছেন সমস্ত বড় গল্পকারের মত।

সুনীলের গল্প আমাদের অসম্ভব ভালোলাগার একটি বিষয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্প হল "রাত পাখি", "পলাতক ও অনুসরণকারী", "দূর থেকে দেখা", "গরম ভাত কিংবা নিছক ভূতের গল্প", "পুরি এক্সপ্রেসের রক্ষিতা", "শাজাহান ও তার নিজস্ব বাহিনী"। কত রকম গল্প তিনি লিখেছেন! কত কল্পনা কত বৈচিত্র তাঁর গল্পে। কত রকম মানুষ কত রকমের নিরুপায়োতা তাদের ভেতর। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পের জন্য চিরজীবী হয়ে থাকবেন। আমাদের মনে পড়তে পারে ক্ষুধার গল্প; গরম ভাত, ভয়ানক দারিদ্র্য আর নিঃসহতার গল্প। মনে পড়ে যেতে পারে দেবদূত গল্পটির কথা। কিন্তু চেনা গল্প থেকে সরে

গিয়ে "যদি" গল্পটার কথা বলা হয়। এই গল্প কল্পিত এক উপমহাদেশের, হ্যাঁ এখন তো কল্পনায়ই, তার বাস্তবতা ছিল ১৯৪৭ এর দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার আগে।

দেশভাগের ফলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতৃপুরুষ ফরিদপুর থেকে কলকাতা মহানগরে এসে কোনক্রমে থিতু হয়। সুনীলের কম বয়সে লেখা অর্জুন উপন্যাসে সেই ক্ষতের চিহ্ন আছে। শুধু দেশভাগ নয়, হিন্দু মুসলমান অসাম্প্রদায়িকতা পরস্পর অশ্রদ্ধা সমস্ত কিছুই ছিল তার মনকষ্টের কারণ। ধর্মে ধর্মে ভেদ সুনীলকে পীড়িত করত। এক যুক্তিবাদী লেখক অসম্ভব এক কল্পনার কথা লিখেছেন তার গল্পে, যা আপাতত ভাবে মনে হতে পারে এমন সোনার পাথর বাটিটি কি সত্য? "যদি" গল্পটি সেই গল্প যে। গল্পে আছে এক অখন্ড ভারত।

এমনই এক অসম্ভব অন্যরকম একটি গল্প "ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়"। গল্পটি "ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়" গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। পরে গল্পটি দে'জ প্রকাশনী থেকে "একশটি প্রেমের গল্প" সংকলনে স্থান পায়।

গল্পে উল্লিখিত দুটি ছেলে-মেয়ে দুটি জাগতিক বস্তু ও অর্থগত জীবনের সঙ্গে কোন লেনদেন নেই। তারা এমন একটা দিন কাটাতে ভালবাসে যার সঙ্গে অর্থের কোন যোগ নেই। তাই কাপ প্লেটে আবদারি সাহেব চা দিতে আসলে তারা বলে—"মাফ করবেন আমাদের আমরা বাসন-কোসনে কিছু খাই না"। এলানো মাটিতে ছড়ানো তাদের পোশাক দেখে মনে হয় তারা বাউলসম্প্রদায়ের। গল্পের প্রধান চরিত্র রশিদ খান সাধারণত কাউকে ভিক্ষা দেননা, কারণ তিনি পরিশ্রম করাতে বিশ্বাসী। পুঁজিবাদের প্রতিনিধি রশিদ খান ছেলে মেয়ে দুটিকে ৫০০ টাকার নোট দেখিয়ে লোভ ধরায়, তাদের পাপের দুনিয়াতে পদস্খলন করাতে চায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও মুদ্রা ছেলে মেয়ে দুটির কাছে অর্থহীন বস্তু, তাতে তাদের লোভ নেই। তারা আজ মুদ্রা ছোঁবে না কারণ, তাদের আজ মন ভালো আছে। যেখানে জৈবিক অনুভূতি সকল মানুষ লোভী হয় সেখানে এরা মন সঙ্গত সংযত রাখতে জানে, জানে মানসিক স্থিরতা, জানে সঞ্চয়ের পরিণতি শূন্যতা। অতএব সঞ্চয়ের দরকার নেই।

গল্প এগোলে দেখা যায় বৃষ্টি ভেজা ছেলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রশিদ খান তার সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলে "পাগল আর কাকে বলে, বয়স কম ভিজুক"। আসলে তার ধারনা ভুল কারণ এটি কোন রোমান্টিক আখ্যান নয় তাই আলাদা করে জোৎস্না, বৃষ্টির রোমান্টিকতা দেখানোর প্রয়োজন পড়েনা। আমরা কিভাবে ক্রমাগত প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জটিল যান্ত্রিক জগতে অবগাহন করছি সহজকে করে তুলেছি জটিল সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এই যুবক-যুবতী দুটি।

একসময় মেয়েটি হারিয়ে যাবার পর ছেলেটিকে দেখে মনে হয়েছে বিচ্ছেদে নয় বরং ফিরে আসায় বিশ্বাসী তারা। এটাই যেন প্রেমের চূড়ান্ত স্তর। মনে পড়ে বাউলের আধ্যাত্মিকতা,—আত্মা পাখি শরীর খাঁচা। মনে পড়ে সে বিখ্যাত গানটির কথা ' আমার হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে'। নারী পাচার চক্রের হাতে পড়ে মেয়েটি ধর্ষিতা হলেও ছেলেটির কোন যায় আসে না, কারণ বাউল সাধনা হলো ইন্দ্রিয়কে ছাড়িয়ে ইন্দ্রিয়াতীতের দিকে যাত্রা। আমরা যারা ভোক্তা, আমরা যারা ক্রমাগত "কাস্টমার"-এ পরিণত হয়েছি, হয়ে চলেছি তারা ফ্রি-এর দ্রব্য পেতে নিজেকেই মূল্য হিসেবে বিক্রি করতে চায়। কিন্তু বাস্তবকে ছাড়িয়ে ছাপিয়ে এই গল্পটি যেন একটি মূল্যবোধের, নিজেদেরকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখার একটা পার্ট।

মেয়েটির শরীরের অত্যাচারের কোন চিহ্ন আছে কিনা রশিদ খান তা জানতে চাইলে মেয়েটি বলে শরীর যখন নিজের নয় এই বোধ পাকা হয় তখন অত্যাচারকে করল না করলো না তাতে কিছু যায় আসে না। অর্থাৎ কোনরকম বাহ্যিক অনুভূতি আর গ্রহণীয় নয়। উচ্চ জ্ঞানের কথা জানতে অনুশীলন করতে হয়

কিন্তু যে সহজাত তাকে আর আলাদা করে বোঝার দরকার নেই। সহজ কথায় যায়না বলা সহজে। কিন্তু যারা বোঝে তারা প্রাজ্ঞ। রুক্ষ মরুভূমিতেও এমন কিছু আছে যা আস্বাদনযোগ্য। ছেলেমেয়ে দুটির মনে করে গানের অনুভূতির কাছে জীবনের অনুভূতি, জাগতিক অর্থশূন্যতার অনুভূতি তুচ্ছ। জীবনের অকুল সমুদ্র আসা-যাওয়ার মাঝে শুধু বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মর্যাদা ছেলেমেয়ে দুটি করতে জানে। তাই গল্পের শেষে এই অনুভূতি জেগে ওঠে তোমাকে ঘিরে আমার আমাকে ঘিরে তোমার। গল্পের শেষ মুহূর্তে দেখা যায় মেয়েটি যখন বলে ওঠে—'ফুল কোথায় গো? যে ফুলে ভ্রমর বসেনি'। অর্থাৎ তারা এখানে একে অপরের পরিপূরক। আবার ছেলেটি যখন বলে—'নদীতে নাই জলের ধারা নদী আছে সেই খানে'। এই উক্তি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। বস্তুজাগতিক আমরা ক্রমাগত অর্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের ভাবনাচিন্তা, আমাদের অনুভূতি, আমাদের সম্পর্ক যেখানে শর্তসাপেক্ষ, সেখানে কি করে এই ছেলেটি এইরকম কথা বলতে পারে। তাই সে বলে জল ছাড়া পূর্ণতা নেই। আমি আধার, তুমি আধেও। অসংলগ্ন একটি গানের সুরে তাদের কথোপকথন হয়। সেখানে আধখানা একাদশীর চাঁদ পূর্ণতার দিকে যাত্রা করে। একে অপরের প্রেমের সৌরভে দেখার মাঝেও অ-দেখাকে দেখতে চাওয়ার প্রতি ধাবিত হয়।

রশিদ খান মনে করে এ যেন কোনো হিন্দি সিনেমা! যেখানে জীবনকে লর্জার দ্যান লাইফ হিসাবে দেখানো হয়। আসলে আমরা যারা কাস্টমার, যারা সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি আগ্রহী সেখানে এই চরিত্র দুটি আচরণ রশিদ খানের মনে এক অনন্য অনুভূতির জন্ম দেয়। মরুভূমি হল বাস্তবের প্রেম, স্নেহ, বিশ্বাসের রসহীনতা। জাগতিক চোখে যাতে অপ্রাপ্যোনিয়ার লোভ মিশে আছে। ছেলে-মেয়ে দুটির দৈব উপস্থিতি দেখার জন্য তা সঠিক নয় রশিদের জীবনে উল্টো কাউন্টডাউন শুরু হয়, যা অবিশ্বাস থেকে চেতনবিশ্বের পথে যাত্রারই নামান্তর। এই ছেলে মেয়ে দুটি এই পৃথিবীর কেউ নয়। যে পৃথিবী জাগতিক সুখ সর্বস্বতায় পরিপূর্ণ, সেই সুখ সর্বস্বতা কতটা ঠুনকো সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় গল্পের ছেলে মেয়ে দুটি। এরা আসলেই এই পৃথিবীর কেউ নয়। বা বলা ভালো এই ছেলেমেয়ে দুটি যে পৃথিবীর কথা বলতে চায়, যে জগৎ রচনা করতে চায় আমাদের অতি পরিচিত এই জগতের মাঝখানে আসলে আমরা, কাস্টমার আমরা, সেই পৃথিবীর কেউ নই।

৩১০.৪.১৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়' গল্পের ভাষা কবিতা কেন্দ্রিক—এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য আলোচনা করো।

২। 'ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়' গল্পে বস্তু জগতের প্রতি যে একটা ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি আছে তা আলোচনা করো।

৩। 'ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়'—গল্পটি কী রূপক ধর্মী গল্প তোমার মতামত জানাও?

৩১০.৪.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ — বীরেন্দ্র দত্ত

২। পঞ্চাশের দশকের কথাকার — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

৩। ছোটগল্পের বর্ণমালা — সুমিতা চক্রবর্তী

৪। বাংলা ছোটগল্পের অপরার্ধ — তপোধীর ভট্টাচার্য